১

মুক্তি আন্দোলনের আঞ্চলিক পটভূমি

ভূমিকা

বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ভারতের রাজনীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। ইংরেজদের প্রতি অনুগত্য প্রদর্শন ও সহযোগিতার পাশাপাশি ভারতীয়দের মধ্যে স্বার্থ আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতনতা লক্ষ করা যায়। ১৯০৫-১৯৪৭ সাল এই সময় পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্ন গতিতে এগিয়ে যায়। এসময় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্রবল আকার ধারণ করে। মুসলমানদের মধ্যে গড়ে ওঠা মুসলিম জাতীয়তা এবং হিন্দুদের হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এতোদিনের সম্প্রীতি নষ্ট হয়। ধর্মীয় স্বাতন্ত্রবোধের ফলে উভয় সম্প্রদায় ক্রমশ একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ফলে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে বিষয়টি ধর্মীয় রূপ পেতে সময় লাগেনি। হিন্দু সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা ও প্রবল আন্দোলনের ফলে মাত্র ছয় বছরের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করা হয়। বঙ্গভঙ্গের কারণে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায় ও কংগ্রেসের সম্পর্কের যে টানাপোড়েন চলেছিল তা বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে দূর হয়। যদিও রদের পর মুসলমানরা ইংরেজদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। বঙ্গভঙ্গের পর গড়ে ওঠা মুসলমানদের নতুন দল মুসলিম লীগ মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় একমাত্র মুখপাত্রে পরিণত হয়। অন্যদিকে কংগ্রেস পরিণত হয় হিন্দুদের মুখপাত্র হিসেবে। তবে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলের মধ্যে কেন্দ্রীয় বনাম বাংলার নেতৃত্ব কেন্দ্রিক টানাপোড়েন ছিল যা চল্লিশের দশক থেকে প্রকট রূপ নিতে থাকে।

এই ধারার বাইরে অবশ্য বিভিন্ন সময় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং স্বরাজ অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনও হয়েছে। কিন্তু ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের আওতায় নির্বাচনের সম্ভাবনা দেখা দিলে এ ঐক্যে আবার ভাঙ্গন ধরে। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় এ আইনের আওতায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমান নেতারা এই প্রদেশে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন ও জনসাধারণের উন্নতির সুযোগ দেখতে পান।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এরপর এক দশক (১৯৪৭ পর্যন্ত) মুসলিম নেতৃবৃন্দ মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ সময় বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে রাজনীতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের উত্থান ও বিকাশ ঘটে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করেন যা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে বিস্তার লাভ করে। এর ফলে ধর্ম কেন্দ্রিক ভারত বিভক্তি নিশ্চিত হয়ে ওঠে। যদিও শেষ মুহূর্তে বাংলার হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি অংশ যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারত তথা বাংলা বিভক্তি

প্রতিরোধের প্রয়াস নিয়েছিলেন। তবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অসহযোগিতার কারণে তা ব্যর্থ হয় এবং ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে চূড়ান্তভাবে ভারত ও বাংলা বিভক্ত হয়।

এ ইউনিট শেষে আপনি ১৯০৫-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারত ও বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত হবেন। বিশেষ করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও প্রতিক্রিয়া. বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, ১৯৩৭-১৯৪৭ সালের অবিভক্ত বাংলায় প্রাদেশিক শাসন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪৭ সালে যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ও বাংলার বিভক্তি আলোচনা করতে পারবেন।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১)
- পাঠ-২. বাংলার সশস্ত্র আন্দোলন (১৯১১-১৯৩৪)
- পাঠ-৩. অবিভক্ত বাংলায় প্রাদেশিক সরকার (১৯৩৭-১৯৪৭)
- পাঠ-৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী
- পাঠ-৫. লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০)
- পাঠ-৬. ১৯৪৭ সালের যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠা প্রস্তাব
- পাঠ-৭ বাংলার বিভক্তি (১৯৪৭)

পাঠ-১

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে পারবেন;*
- *কি কারণে বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে পারবেন;*
- *বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;*
- *বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ নির্ণয় করতে পারবেন;*
- *বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া জানতে পারবেন।*

ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ওই বছরের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জন অবিভক্ত বাংলার ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মালদা জেলার চীফ কমিশনার শাসিত আসামের সাথে সংযুক্ত করে পূর্ববাংলা ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন। যদিও মাত্র ৬ বছরের মধ্যে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করা হয়। ১৯০৫-১৯১১ সাল বাংলার ইতিহাসে ঘটনাবহুল। বঙ্গভঙ্গ ও রদ উপলক্ষে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের সূত্রপাত হয়। অবশ্য বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তবে একথা ঠিক, বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি হতে তৎকালীন মুসলিম সমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেতন হয়ে ওঠে। যদিও ছয় বছর এর স্থায়িত্বকাল ছিল। কিন্তু এই কয়েক বছর মুসলমান নেতৃবৃন্দ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা পরবর্তীকালে অবিভক্ত বাংলার শাসন পরিচালনায় (১৯৩৭-৪৭) যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। বস্তুত, ভারত উপমহাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে বঙ্গভঙ্গ ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু নেতৃবৃন্দ যে স্বদেশী বা স্বরাজ আন্দোলনের সৃষ্টি করে তা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। যদিও হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য যে স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করে তার পরিণতিতে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়।

ক. বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার প্রেক্ষাপট

যদিও কেউ কেউ মনে করেন লর্ড কার্জনই বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে নতুন প্রদেশ গঠনের একক কৃতিত্বের দাবিদার; কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তা ভুল প্রমাণিত হবে। মূলত এটি ছিল সুদীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বেশ ক'জন প্রশাসকের পরিকল্পনার ফসল। লর্ড কার্জনের সময় এসে তা সাফল্যের মুখ দেখে। মজার ব্যাপার হলো, বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় ভারপ্রাপ্ত ভাইসরয় অ্যাম্পটহিলের সময়। এ সময় কার্জন ছুটিতে লন্ডনে ছিলেন।

বাংলাকে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া ও উদ্যোগ লর্ড কার্জনের আগে নিম্নোক্তভাবে শুরু হয়-

১৮৫৩ সালে চার্লস গ্রান্ট বাংলা প্রদেশকে দু'ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দেন। পরের বছর ডালহৌসি একই প্রস্ড়াব করেন। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দূর্ভিক্ষের সময় বাংলা সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ভারত-সচিব লর্ড নর্থকোট যে কমিটি নিযুক্ত করেন, তার রিপোর্টেও বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার সুপারিশ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার এ সকল বিবেচনা করে আসামকে বাংলা থেকে পৃথক করে চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে পরিণত করে। ১৮৯৬ সালে আসামের চীফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলাকে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করার পরামর্শ দেন। তবে শেষপর্যন্ত প্রতিবাদের কারণে তা নাকচ হয়ে যায়। ১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের বড়লাট হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। শিক্ষা, কর্মদক্ষতা, দায়িত্বজ্ঞান এবং সর্বোপরি এ অঞ্চল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়েই তিনি ভারতে আসেন। তাঁর শাসনকাল (১৯৯৮-১৯০৫) নানাদিক থেকে তাই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে সকল সংস্কার কার্যাবলীর মধ্যে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৎকালে সমগ্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে ছিল বঙ্গদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি। এ অংশের লোকসংখ্যা ছিল সমগ্র উপমহাদেশের এক-তৃতীয়াংশ। লর্ড কার্জন প্রথম হতেই এত বড় প্রদেশকে একটি মাত্র প্রশাসনিক ইউনিটের অধীনে রাখা অনুচিত মনে করেন।

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার বাংলার সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারগুলোর মতামত জানতে চাইলে তারা পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার সীমানা রদবদলের পর তা অনুমোদন করে। বলাবাহুল্য, ১৯০৩ সালের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি প্রবল গণ-অসন্তোষের শিকার হয়। বিভিন্ন মহল এমন কি মুসলমানদের পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ আসে। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কার্জন পূর্ববঙ্গ সফরে এসে সর্বত্রই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী উত্তেজনা লক্ষ করেন। তিনি কয়েক স্থানের ভাষণে প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাসে আরো কিছু এলাকা যুক্ত করার ইঙ্গিত দেন। যার ফলে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর, একটি আইন পরিষদ ও পৃথক রাজস্ব বোর্ড নতুন প্রশাসনিক এলাকার মধ্যে থাকবে। তিনি নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় করার এবং এ অঞ্চলের মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। এরপর কার্জন প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি পুনরায় পর্যালোচনা করেন এবং কিছু সংযোজনসহ ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুমোদনের জন্য ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। নতুন বিন্যাসে আসামের সঙ্গে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ছাড়াও দার্জিলিং বাদে জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। ঢাকায় নতুন প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করা হয়। নতুন প্রদেশের নামকরণ করা হয় 'পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ'। এর আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৪০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ। তারমধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান ও ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার নতুন প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত হন।

খ. বঙ্গভঙ্গের কারণ

প্রশাসনিক কারণঃ সুমিত সরকারের মতে, ১৯০৩ সাল পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের পেছনে সরকারের প্রশাসনিক ইচ্ছাই অধিক কাজ করেছে। মূলত নতুন প্রদেশ গঠনের পেছনে প্রশাসনিক সুবিধা ও দক্ষতা বৃদ্ধিই ছিল কার্জনের মূল উদ্দেশ্য। ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই সমগ্র বাংলার শাসনব্যবস্থা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যাতায়াত সমস্যা এবং প্রদেশের অন্তর্গত প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা দীর্ঘদিন যাবত অবহেলিত ছিল। এ অবস্থা শুরু হয় সুদূর অতীতে, যখন মুর্শিদকুলী খান ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন। ফলে ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও রাজধানীর ওপর নির্ভরশীল গোষ্ঠী ঢাকা ছেড়ে সেখানে গমন করে। কালক্রমে তারাই কলকাতায় প্রভাব বিস্তার করে। কারণ, ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর মুর্শিদাবাদ থেকে শাসনযন্ত্র কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববাংলা অবহেলিত থাকে।

পূর্ববাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল দুর্বল, অদক্ষ এবং সে কারণে কার্যকর ও সক্রিয় ছিল না। জনকল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য যে অর্থ এ এলাকায় ব্যয় করা হতো, তা ছিল বাস্তব প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। তাছাড়া এ অঞ্চলের প্রধান সমস্যাবলীকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করা হতো। শিক্ষা ছিল অবহেলিত; যোগাযোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা অনুন্নত। পূর্ববঙ্গের কৃষকরা কলকাতায় অবস্থানকারী জমিদারদের এজেন্ট ও কর্মচারীদের হাতে অত্যাচারিত হতো। ব্যবসা- বাণিজ্যের দিক থেকেও এ অঞ্চল দারুণভাবে পিছিয়ে পড়ে। চট্টগ্রামের কোন উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়নি; অথচ বৃহত্তর কলকাতা অচিরেই ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রত্যাশা অনুযায়ী উপমহাদেশে ব্রিটিশ সংস্কৃতি,আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব বিস্তারের জন্য একটি অগ্রভূমিতে পরিণত হয়।

তবে একথা ঠিক, শাসনতান্ত্রিক দিক বিবেচনা করলে বাংলা প্রদেশের বিশালত্ব এর অন্যতম কারণ। বাংলা ছিল ভারতের বৃহত্তম প্রদেশ। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রিইজলি'র ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে লিখিত এক চিঠিতে জানা যায় যে, বাংলা সরকারকে বিরাট প্রদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব ছাড়াও রাজস্ব আদায়, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রসার এবং আরো অনেক জটিল সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। এ সমস্ত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দায়িত্ব লাঘব অত্যাবশ্যক ছিল। রিইজলি ভৌগোলিক সীমারেখার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রশাসনিক উন্নতির জন্য এ সমস্ত পরিবর্তন যে সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ, সে বিষয়টি উল্লেখ করেন। সংক্ষেপে এ কথা বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার পিছনে বঙ্গ প্রদেশের বিশাল সীমারেখা একটা বড় কারণ ছিল।পশ্চাৎপদ আসাম ও পূর্ববাংলাকে যুক্ত করে এক উন্নয়নের সমান্তরাল ধারায় নিয়ে আসার মহৎ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল।

রাজনৈতিক কারণঃ সুমিত সরকারের মতে, ডিসেম্বর ১৯০৩ থেকে ১৯ জুলাই ১৯০৫ সালের মধ্যে "Transfer plan was transformed into full scale partition"। এ সময়ের রাজনৈতিক অভিলাষ ছিল পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বিভক্ত করা। ১৯০৩ সালের ২৮ মার্চের চিঠিতে ফ্রেজার প্রথমবারের মতো বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক ফায়দার কথা উল্লেখ করেছিলেন। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের অভিমত, বঙ্গভঙ্গের পিছনে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল মুখ্য।

প্রথম দিকে প্রশাসনিক উদ্দেশ্য থাকলেও শেষ পর্যায়ে এর সঙ্গে রাজনৈতিক সুবিধাগুলোও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এবং যুক্ত হয় রাজনৈতিক আয়তন। কার্জন যখন প্রস্তাবের পক্ষে পূর্ববঙ্গ সফর শুরু করেন, তখন তিনি বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখীন হন। পূর্ববঙ্গে প্রস্তাবের পক্ষে কেউ ছিল না, তা কিন্তু নয়। সেই নির্বাক পক্ষভুক্ত

মানুষদের কার্জন চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং এ থেকে তিনি রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চেয়েছিলেন। ফলে ব্রিটিশদের সনাতন নীতি Divide and Rule Policy অনুসরণ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক দিকটি তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যদিও আমরা লক্ষ করি এ দিকটি গোপন রাখার ব্যাপারে ইংরেজ সিভিলিয়ানরা সতর্ক ছিলেন।সামগ্রিকভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি এলিটদের একটা ক্ষোভ ছিলই। এ ক্ষোভ এবং স্বাতন্ত্রবোধের বিষয়টি ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল তা বলা যাবে না। একটা শতাব্দীর শুরু বা শেষ মহাকালের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ না হতে পারে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে বিংশ শতকের প্রারম্ভ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রিটিশ ভারতের বিংশ শতক শুরু হয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে। এ সম্ভাবনাকে ব্রিটেনের নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত 'অশুভ' বলে চিহ্নিত করেন। ভারত সাম্রাজ্য সম্পর্কে আঠার ও উনিশ শতকে যে নিশ্চিন্ততার ভাব তাদের মধ্যে ছিল, বিশ শতকের শুরুতে তা আর রইল না। মূলত ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে আরম্ভ করে।এ সকল আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। ভারতের বৃহত্তম প্রদেশ বাংলাকে বিভক্ত করে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতি স্তিমিত করে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

দ্বিতীয়ত, বিশ শতকের প্রথম হতেই রাজনীতি সচেতন ভারতীয়গণ ইংরেজ শাসকদের সমীপে নতুন সমস্যা ও দাবি উত্থাপন করতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে প্রদেশটিকে ছোট করলে সমস্যা ও দাবি মেটানো সহজ হবে বলে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

তৃতীয়ত, যুক্ত বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমেই তীব্রতর হতে থাকলে হিন্দু ও মুসমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে এই জাতীয় কর্মকান্ডকে স্তিমিত করার উদ্দেশেও ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের আগ্রহ প্রকাশ করে।

চতুর্থত, মুসলিম নেতৃবৃন্দ নতুন প্রদেশের শাসন কাঠামোকে কেন্দ্র করে নিজেদের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ়করণপূর্বক রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বলে যুক্তি দেখানো হয়।

পঞ্চমত, আলীগড় আন্দোলনের প্রভাবে মুসলমান পুনর্জাগরণের ফলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বঙ্গভঙ্গের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন পূর্ববঙ্গের আপামর জনসাধারণ।

অর্থনৈতিক কারণ: কলকাতা ছিল অবিভক্ত বাংলার প্রাণকেন্দ্র।স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববাংলার ঢাকা ছিল অবহেলিত বিশেষ করে বাঙালি এলিট শ্রেণীভুক্ত লোকদের কলকাতায় অবস্থান একে সর্বভারতীয় মিলনস্থল হিসেবে গড়ে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সেখানে গড়ে ওঠে। পূর্ববাংলার রাজধানী এ সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল।

দ্বিতীয়ত, পূর্ববাংলায় জমিদারি ব্যবস্থা থাকলেও জমিদারগণ অবস্থান করতেন কলকাতায়। তাদের নিযুক্ত লোকজন নিরীহ পূর্ববঙ্গবাসীদের ওপর শোষণ করত। আর এর সুফল ভোগ করতেন কলকাতাবাসী জমিদারগণ, পূর্বের অর্থ এভাবে পশ্চিমে ব্যয় হতো।

তৃতীয়ত, তৎকালীন সময়ে সরকারি চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য থাকায় পূর্ববাংলার মুসলিম জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লে নিজেদের আর্থিক উন্নতির জন্য পূর্ববঙ্গবাসী বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলন করে।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ: ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে তাদের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য হারাতে থাকে। ফলে ১৯০৫ সালে পূর্ববাংলার মুসলিম

সমাজ তাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের আশায় ব্রিটিশ সরকারে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব জোরালোভাবে সমর্থন করে। তাছাড়া অনেক আগে থেকেই পূর্ববাংলায় মুসলমান এবং পশ্চিম বাংলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য লক্ষণীয় ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, প্রত্যেকে তাদের স্বধর্মের মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে চাইবে, সেজন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ে স্বাধীনতা তথা মুক্ত পরিবেশ। বলা বাহুল্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পূর্ববাংলার মুসলমানরা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে হিন্দু জমিদার ও প্রভাবশালীদের হাতে বাধাগ্রস্ত হতো। এজন্যে নতুন প্রদেশে নিজেদের জীবনদর্শন অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশে মুসলমানদের মধ্যে যে জাগরণ দেখা দেয়, তা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে।

পূর্ববাংলা শোষণ: কলকাতায় বসবাসকারী জমিদারগণের আরাম-আয়েসের জন্য ব্যয়িত অর্থ সংগ্রহ করা হতো পূর্ববাংলার কৃষকদের নিকট থেকে। অথচ এখানকার কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য তারা কোনরূপ দৃষ্টি দিতেন না। সর্বোপরি, কৃষকদের ওপর জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারের শোষণনীতির ফলে এখানকার জনজীবনে যে কালো ছায়া দেখা দেয়, সেটাই অবহেলিত পূর্ববঙ্গ বাসীদের বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে বৈষম্য: ভারতবর্ষের রাজধানী হিসেবে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বাংলা প্রদেশের সকল প্রকার শিক্ষা ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করা হতো। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ববাংলা হতে সরবরাহকৃত কাঁচামালের বদৌলতে কলকাতার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। অপরদিকে, উন্নয়নমূলক কাজের অভাবে পূর্ববাংলাবাসীদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। ফলে এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অত্যন্ত আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

মুসলিম পুনর্জাগরণ: অধিকার বঞ্চিত মুসলমানদের দাবি আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন মনীষীদের সোচ্চার আবেদন তাদেরকে আত্মসচেতন করে তোলে। ফলে পূর্ববাংলা ও আসাম নিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠনের উদ্দেশে গঠিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এই এলাকার মুসলমানদের মধ্যে ক্রমে তীব্রতর হয়ে ওঠে।

ভাগ কর, শাসন কর নীতি (Divide and Rule Policy): বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের আন্দোলন বা দাবির ফসল ছিল না। পরবর্তীকালে এর ঘোর সমর্থক ও প্রবর্তক ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্ স্বয়ং শুরুতে এ ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ব্রিটিশ শাসকদের নিকট থেকে আসে। কার্যত এটি ছিল ব্রিটিশদের চিরাচরিত Divide and Rule Policy'র ধারাবাহিকতা। প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম জনমত গঠনের লক্ষে ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে পূর্ববাংলার কয়েকটি বড় শহর ভ্রমণের সময় লর্ড কার্জন যে ভাষণ দেন, তা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। ঢাকার জনসভায় তিনি বলেন,"ঢাকা এখন তার পূর্বের ছায়া মাত্র। বঙ্গভঙ্গ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যা এসব জেলার জনগণকে তাদের সংখ্যাধিক্য ও উচ্চতর সংস্কৃতির বদৌলতে বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট জেলাসমূহে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম করবে এবং পূর্ববাংলার মুসলমানদের মধ্যে এমন ঐক্য গড়ে তুলবে, যা তারা প্রাচীন মুসলমান ভাইসরয় ও রাজাদের আমলের পর আর কখনো অর্জন করতে পারেনি।" লর্ড কার্জনের এ ভাষণের সারকথা ছিল হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলিম মানস জাগিয়ে তোলা এবং কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু প্রধান পশ্চিম বাংলার বিপরীতে নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলিম প্রধান পূর্ববাংলাকে দাঁড় করানো।

গ. বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন

১৯০৩ সালের শেষ নাগাদ প্রথমবারের মতো বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব জনসাধারণে প্রকাশিত হওয়ার পর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তবে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। হিন্দু রাজনীতিবিদ, জমিদার, সাংবাদিক, আইনজীবীরা এর বিরুদ্ধে বেশি প্রতিবাদমুখর ছিল। তারা

বঙ্গভঙ্গকে জাতীয় সংহতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি আঘাত বলে অভিহিত করেন। হিন্দু নেতৃবৃন্দ একে বাঙালি বিরোধী, জাতীয়তাবাদ বিরোধী ও বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত করেন। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মন্তব্য করেন, বাংলা বিভাগ করে হিন্দুদের অপমান ও অপদস্থ করা হয়েছে। এছাড়া গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দু ঘোষ, বিপরীনচন্দ্র চান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। কংগ্রেস নেতৃবন্দ সরাসরি বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে যোগ দেন। যেদিন বঙ্গভঙ্গ সরকারিভাবে ঘোষিত হয় পর বৎসর সেদিন কংগ্রেস দেশব্যাপী শোক দিবস পালন করে। বাঙালির ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক 'রাখিবন্ধন' অর্থাৎ বাহুতে লাল ফিতা ধারণ করে। ১৬ অক্টোবর অনশন করে, সব ধরনের কাজ বন্ধ রাখে, খালি পায়ে হেঁটে গঙ্গা স্নানে যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং রাখিবন্ধনে অংশ নেন। এই আন্দোলন ক্রমে মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। বাংলার সর্বত্র এবং বাংলার বাইরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জোরালো হয়। হিন্দু তরুণরা গঠন করে স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। কুমিল্লা, ঢাকা, ফরিদপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, পাবনাসহ পূর্ববাংলার বহু স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ১৯০৬ সালের ৭ আগস্ট স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই কর্মসূচির আওতায় বিলেতি পণ্য বয়কট, বিলেতি পণ্যে অগ্নিসংযোগ ও ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে। বাংলায় হিন্দুদের মধ্যে গড়ে ওঠে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা। অনেক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী হত্যার শিকার হয়।

হিন্দু মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো ব্রিটিশ সরকারের ওপর বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। বেঙ্গলী, অমৃতবাজার পত্রিকা স্বদেশী ও বর্জন আন্দোলনের পক্ষে ভূমিকা পালন করে। ফলে হিন্দু বুদ্ধিজীবী, শিক্ষার্থী, জমিদার, কৃষকদের বড় অংশ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। মুসলমান নেতাদের মধ্যে ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, খান বাহাদুর ইউসুফ, লিয়াকত হোসেন স্বদেশী আন্দোলন সমর্থন করেন। স্বদেশী আন্দোলনই ক্রমে স্বরাজ আন্দোলনে পরিণত হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি। মহাত্মা গান্ধী এ কারণে ১৯০৮ সালে মন্তব্য করেন, "বঙ্গভঙ্গের পরেই ভারতের প্রকৃত জাগরণ ঘটেছে। এই বঙ্গভঙ্গই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভাগের কারণ হবে।" আন্দোলনের তীব্রতা সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার প্রকট রূপ লাভের কারণে ব্রিটিশ সরকার শেষপর্যন্ত নতি স্বীকার করে। ১৯০৬ সালে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফুলার পদত্যাগ করেন। ১৯১০ সাল থেকেই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদের গোপন তৎপরতা চালায়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লি দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। নতুন পরিকল্পনায় বর্ধমান প্রেসিডেন্সী, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম- এই পাঁচটি বাংলা ভাষাভাষী বিভাগ নিয়ে বাংলা প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করা হয়। এই নতুন বাংলা প্রদেশের রাজধানী করা হবে কলকাতায়। বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে পৃথক করা হয়।

ঘ. বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ

১. সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদঃ বঙ্গভঙ্গের শুরুতেই হিন্দুদের একটি বড় অংশ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে। তাদের মতে এটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। কাশিমবাজারের মহারাজা মহীন্দ্রচন্দ্র নন্দ্রীর একটি মন্তব্য থেকেই এর পেছনে হিন্দু জমিদারদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়। তিনি বলেন, "নতুন প্রদেশে মুসলমানরা হবে সংখ্যাগুরু আর বাঙালি হিন্দুরা সংখ্যালঘু। ফলে স্বদেশেই আমরা হব প্রবাসী।" এভাবে হিন্দু নেতৃবৃন্দ এমনকি কংগ্রেসও এতে যুক্ত হওয়ায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ক্রমান্বয়ে মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। স্বার্থগত কারণে হিন্দু জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এমনকি বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশও এতে যোগ দেন। এভাবে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমান্বয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নেয়।

২. অর্থনৈতিক কারণ: ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসনের শুরুতে যেসব জমিদারদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়, এদের বড় অংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। জমিদারদের বড় অংশ আবার কলকাতায় বিলাস-ব্যসনে ব্যস্ত থাকতেন এবং নায়েব গোমস্তাদের দিয়ে কর আদায় করতেন। ঢাকায় রাজধানী হলে ঢাকার অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে এ আশংকায় কলকাতাকেন্দ্রিক জমিদার ও ব্যবসায়ীরা এর বিরোধিতা করেন। কলকাতার আইনজীবীরা মনে করতেন এর ফলে ঢাকায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের পূর্ববঙ্গের মক্কেলরা সেখানকার আইনজীবীদের কাছে যাবে। সাংবাদিকরা মনে করতেন ঢাকায় নতুন নতুন পত্রিকা বের হলে তাদের পত্রিকার চাহিদা কমে যাবে। এভাবে স্বার্থগত কারণে বাঙালি হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। গবেষক ড. বি. আর. আমবেদকর (Ambedkar) বলেন, মুসলমানরা পূর্ববাংলায় যাতে তাদের যথার্থ স্থান না পায় মূলত এই দূরভিসন্ধি থেকেই হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছে।

ঙ. বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া: ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও নতুন প্রদেশ গঠন পূর্ববঙ্গে মুসলিম সমাজে ব্যাপক প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে ঢাকায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্পর্কে এক হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ১৯০৫-১১ পর্যন্ত এই ৫ বছরে মুসলমান শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৩৫% বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলমানদের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে সুবিধা বৃদ্ধির পথ সুগম হয়। তাই বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানরা মর্মাহত হয় এবং ব্রিটিশ সরকারকে চরম বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী বলে আখ্যায়িত করে। নওয়াব ওয়াকার উল মূলক বলেন, বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে ভবিষ্যতে মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারের কোনো কথা ও কাজে আস্থা রাখতে পারবে না। এছাড়া ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করেন মওলানা মোহাম্মদ আলী এবং নবাব সলিমুল্লাহ। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের বিক্ষোভের ফলে বাঙালি মুসলমানরা অবাঙালি মুসলমানদের সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের একমাত্র দল মুসলিম লীগ প্রথম থেকেই বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিল। বঙ্গভঙ্গ রদকে কেন্দ্র করে মুসলমানরা মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে। এরপর মুসলিম লীগ মুসলমানদের মুখপাত্রে পরিণত হয়। তারা মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি করে যা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়। ১৯১৩ সালে লক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের জন্য স্বরাজ দাবি দলের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুসলমান তরুণরা রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিবর্তনের দাবি জানায়। নবাব সলিমুল্লাহ যিনি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন বঙ্গভঙ্গের পর স্বেচ্ছায় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। বঙ্গভঙ্গের পরের বছর লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা এলে তিনি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। অবশ্য তাঁর জীবদ্দশায় না হলেও ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচন স্বীকৃত হয় এবং বাংলার মুসলমানদের জন্য শতকরা ৪৮ ভাগ আসন দেয়া হয়। ১৯৩৭-১৯৪৭ পর্যন্ত সময়কালে পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া: বঙ্গভঙ্গ রদ করায় হিন্দুগণ সন্তোষ প্রকাশ করে। কংগ্রেস সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার ব্রিটিশ সরকারকে অভিনন্দন জানান। কংগ্রেসের ইতিহাস লেখক পট্টভি সীতারাময় লিখেছেন, ১৯১১ সালে কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ করে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসনে ন্যায়নীতির পরিচয় দেয়।

হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষঃ এন.সি. চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীতে যথার্থই বলেছেন,"বাংলা বিভাগ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি স্থায়ী বিরোধের কারণ রেখে যায় এবং মুসলমানদের প্রতি একটি চরম ঘৃণা আমাদের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করে।" ফলে বন্ধুত্বের সর্বপ্রকার অন্তরঙ্গতা দূর হয়। সর্বত্র এই বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু-মুসলমানরা একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও সংঘটিত হয়। এরপর যেকোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাপকাঠি নির্ণীত হয় ধর্ম পরিচয়ে। অবশেষে ধর্মের ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়।

সারসংক্ষেপ

বঙ্গভঙ্গের উদ্যোগ প্রথমে ছিল প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব দেওয়া থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়া পর্যন্ত সারা বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনকারীরা প্রথমবারের মতো সারা বাংলায় একটি আন্দোলন গড়ে তোলার পদ্ধতি তৈরি করে। হিন্দুদের এই আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হয়। অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায় স্বার্থ সংরক্ষণে সচেতন হয়। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত স্থায়িত্ব লাভ করে। বহু চেষ্টা করেও তাই ১৯৪৭ সালে যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সফল হয়নি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *বঙ্গভঙ্গ*, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।
২। মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০২।
৩। জন আর ম্যাকলেন, "বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) : হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খন্ড, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন-
(ক) লর্ড ডালহৌসি (খ) লর্ড কার্জন
(গ) লর্ড রিপন (গ) লর্ড হার্ডিঞ্জ।

২। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় ১৯০৫ সালের-
(ক) ১৬ জানুয়ারি (খ) ১৬ আগস্ট
(গ) ১৬ অক্টোবর (ঘ) ১৬ ডিসেম্বর।

৩। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর বাংলা ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর হন-
(ক) লর্ড কার্জন (খ) লর্ড হার্ডিঞ্জ
(গ) লর্ড রিপন (ঘ) ব্যামফিল্ড ফুলার।

৪। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুদের পরিচালিত নতুন আন্দোলনের নাম-
(ক) স্বদেশী আন্দোলন (খ) অসহযোগ আন্দোলন
(গ) সশস্ত্র আন্দোলন (ঘ) খেলাফত আন্দোলন।

৫। বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষিত হয় ১৯১১ সালের-
(ক) ১২ জানুয়ারি (খ) ১২ অক্টোবর
(গ) ১২ নভেম্বর (ঘ) ১২ ডিসেম্বর।

৬। বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন-
(ক) পঞ্চম জর্জ (খ) ষষ্ঠ জর্জ
(গ) লর্ড মিন্টো (ঘ) লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক কারণ লিখুন।

২। বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য কংগ্রেস ও হিন্দু রাজনীতিবিদরা কী কর্মসূচি গ্রহণ করেন লিখুন।

৩। বঙ্গভঙ্গ রদে মুসলমানদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। কী কারণে বঙ্গভঙ্গ করা হয় লিখুন।

২। বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ ও ফলাফল সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ-২

বাংলার সশস্ত্র আন্দোলন (১৯১১-১৯৩৪)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *আন্দোলনের জন্য গড়ে ওঠা সংগঠন ও নেতাদের কর্মকান্ড জানতে পারবেন;*
- *এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *এই আন্দোলনের গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারবেন।*

উনিশ শতকের শেষ দিকে ভারতে যে জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত হয়, তা বিকাশ লাভ করে সশস্ত্র তথা বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে। বাংলায় এ সশস্ত্র আন্দোলন বিপ্লবী আন্দোলন নামে পরিচিত হলেও শাসক ইংরেজদের দৃষ্টিতে তা ছিল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। মূলত জাতীয়তাবাদের শুরু হয় নিষ্ক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে। এর ফলে দ্রুত তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে সশস্ত্র আন্দোলন বা বিপ্লববাদ। কিন্তু প্রচলিত অর্থে সন্ত্রাসবাদ বলতে যা বুঝায়, বাংলার এই আন্দোলনের জন্য তা পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। কারণ বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য শুধু বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সন্ত্রাস নয়, বরং তা ছিল বাংলা তথা উপমহাদেশ হতে ব্রিটিশ শক্তিকে চিরতরে উৎখাত করে স্বাধীনতা অর্জন করা, দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করা। সেই বিবেচনা থেকে একে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করাই যুক্তিযুক্ত। যদিও এ বিপ্লব শেষপর্যন্ত সফল হয়নি।

ক. বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য

বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হলেও তা প্রকৃতিগত কারণে ছিল কংগ্রেস সমর্থিত দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আন্দোলনের পদ্ধতির প্রশ্নে ১৯০৬ সালে কংগ্রেস দল নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমোক্ত শাখাটি বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনকে বিঘ্নিত করার পক্ষে থাকলেও অপর শাখাটির লক্ষ ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের ব্যর্থতাই সশস্ত্র আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল। বাংলায় বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন শুরু হলেও ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পরও তা থেমে যায়নি। ১৯০৮ সালে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার উদ্দেশে তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরামের বোমা নিক্ষেপের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করে।

এই বিপ্লবের কারণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জি.অধিকারী মনে করেন, ১৯১৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় বিপ্লবীদের ধারণা ছিল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ। তবে এর পেছনে প্রথমত, ধর্মীয় কারণ বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধে উজ্জীবিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের বুদ্ধিবাদী প্রবক্তরা বেশি অনুপ্রাণিত করেছিলেন যুবকদের। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বঙ্কিম, তিলক, অরবিন্দ-এর মতো ব্যক্তিত্বরা যাঁরা যুবকদের কাছে এর চরিত্র হিসেবে ধর্মযুদ্ধকে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয়, কারণটি ছিল কংগ্রেসের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি মোহভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গ তাদের এতো দিনের ব্রিটিশ সরকারকে

সহযোগিতার নীতিতে চিড় ধরায়। তৃতীয়ত, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা চাকরি ক্ষেত্রে সুবিধা পাবে- এ ভয়ও হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যে ছিল।

খ. সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য গড়ে ওঠা সংগঠন ও নেতৃবৃন্দের কর্মকান্ড

দু'পর্যায়ে বিভক্ত এ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় বঙ্গভঙ্গের পর থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত (১৯০৬-১৪) এবং দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪) থেকে শুরু করে ১৯৩৪ পর্যন্ত অভিহিত করা যায়। প্রথম পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অসংগঠিত ও বিক্ষিপ্ত আন্দোলন, গুপ্ত হত্যা, সন্ত্রাস, বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ। যদিও দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলন সংগঠিত ও পরিকল্পিত হয়। বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে আন্দোলনকারীরা তাদের কর্মকান্ড চালায়। এই আন্দোলনের দু'টি ধারা ছিল। প্রথমত, ইংরেজ কর্মচারী ও তার সহযোগীদের হত্যার মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করা যাতে প্রশাসন পঙ্গু হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, অস্ত্র যোগাড় করে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে লড়াই করে দেশ স্বাধীন করা।এ উদ্দেশে গড়ে ওঠা সমিতির মধ্যে ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' এবং কলকাতার 'যুগান্তর' ছিল উল্লেখযোগ্য। অনুশীলনের ৫০০-এর বেশি শাখা ছিল। বাংলার বিভিন্ন জেলায় সশস্ত্র বিপ্লবীরা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। বরিশালে 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', ফরিদপুরে 'ব্রতী সমিতি' ও ময়মনসিংহে 'সুহৃদ সমিতি' ও 'সাধনা সমিতি' ছিল অনুশীলন সমিতির শাখা সমিতি। এসব সভা বা সমিতিতে তরুণ সদস্যদের বল্লম, লাঠি চালনা শিক্ষা দেয়া হতো। যদিও মূল উদ্দেশ্য ছিল তরুণদের বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করা। অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠক ছিলেন পুলিন বিহারী দাস। গুপ্ত হত্যা, সন্ত্রাস ও ডাকাতির মাধ্যমে ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত রাখার জন্য এসব সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা বোমা তৈরি, অস্ত্র সংগ্রহসহ নানাবিধ কাজে জড়িয়ে পড়েন। ঢাকার 'ন্যাশনাল স্কুল' ও 'সোনারং ন্যাশনাল স্কুল' বিপ্লবী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পূর্ববাংলা ও আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে তারা দুবার হত্যার চেষ্টা করে।

১৯০৮ সালে অনুশীলন সমিতি অবৈধ ঘোষণার পর এটি গুপ্ত সমিতিতে পরিণত হয়। এই সমিতির দীক্ষা গ্রহণের পর সদস্যরা চার রকমের প্রতিজ্ঞা করা হতো- আদ্য প্রতিজ্ঞা, আন্ত প্রতিজ্ঞা, প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা, দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞার সময় তা করানো হতো কালীবাড়ি বা দেবী মূর্তির সামনে। ত্রৈলোক্যনাথের মতে, সমিতির সদস্যদের প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন যারা বিপ্লবের জন্য ঘরবাড়ি ত্যাগ করেছেন। এদের অনেকেই ছিলেন পলাতক আসামী। সাধারণ সভ্যরা ছিলেন পরবর্তী শ্রেণীর। এদের সম্পর্কে আশা করা হতো প্রয়োজনে এরাও বাড়িঘর ত্যাগ করবেন। শেষ শ্রেণীতে ছিলেন সংসারী এবং বাড়িঘরে থেকেই সাহায্য করা।

১৯০৮ সালে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় নিয়োজিত প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করেন। একই অপরাধে ধৃত ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। এসময় অনেকের ফাঁসি ও দীপান্তর হয়। ১৯১০ সালে পুলিন বিহারী ৫৫ জন সহ গ্রেফতার হন। সরকারি দমননীতির ফলে এবং বিপ্লবী নেতাদের গ্রেফতার ও রাজনীতি থেকে সরে পড়ার কারণে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের আগেই বাংলার প্রথম পর্যায়ে সশস্ত্র আন্দোলনের তীব্রতা কমে আসে। যদিও কলকাতায় অমৃতবাজারের অমৃত হাজরার পরিচালনায় একটি বোমা কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বিপ্লবীরা আবার সংগঠিত হতে থাকে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক।এ পর্যায়ে আন্দোলনকারীরা সশস্ত্র আন্দোলনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য কলকাতার রাজাবাজারে একটি বোমা কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। দিল্লিতে বিপ্লবীরা লর্ড হার্ডিঞ্জকে উদ্দেশ্য করে বোমা ছোঁড়ে, যদিও তিনি দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যান। এ পর্যায়ে আধুনিক অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বিপ্লবীদের বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানির প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এসময় আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), ডা. যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম.এন.রায়)। জার্মানি থেকে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টাকালে পুলিশের সংগে গুলি বিনিময়ে

ধৃত বাঘা যতীন নিহত হন এবং তাঁর দুই সহকর্মীর ফাঁসি হয়। ১৯১৬-১৭ সালে ভারতের প্রতিরক্ষা আইনে বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হওয়ার পরও আন্দোলন থেমে যায়নি।

দেশী-বিদেশী উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হত্যা অব্যাহত ছিল। ১৯১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পুলিশের ডেপুটি সুপার বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে ভবানীপুরে হত্যা করা হয়। ১৯২১-২২ সালে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন কিছুটা থেমে যায়। এছাড়া ১৯২২ সালে গান্ধিজী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করেন। এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পুনরায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন বেড়ে যায়। ১৯২৩ সালে 'লালবাংলা' নামে এক লিফলেটে অত্যাচারী পুলিশ কর্মচারীদের হত্যার আহবান জানানো হয়। আলিপুর জেলের সুপার বন্দি বিপ্লবীদের পরিদর্শনে গেলে ১৯২৪ সালে প্রমোদ চৌধুরী তাঁকে রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেন। এসব কারণে ১৯২৪ সালে বহু বিপ্লবীকে কারারুদ্ধ করা হয়।

১৯৩০ সালে 'মাস্টার দা' সূর্যসেন চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। ১৯৩৩ সালে বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। ১৯৩০ সালে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত কারা ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে হত্যা করেন। বিনয় ও বাদল আত্মঘাতী হন এবং দীনেশের ফাঁসি হয়। বাঙালি নারীরাও আন্দোলনে পিছিয়ে ছিলেন না। প্রীতিলতা চট্টগ্রামে ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করেন ও নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। বীনা দাস বাংলার গভর্নর জ্যাকসনকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হন। ১৯৩০-৩৩ সালের মধ্যে বহু ইউরোপীয় অফিসার হত্যাকান্ডের শিকার হলে ব্রিটিশ সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাছাড়া এই সময় রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের প্রতি জনগণের আকর্ষণও বেড়ে যায়। ফলে ১৯৩৪ সালের পর সশস্ত্র আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

গ. সশস্ত্র আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

সুদীর্ঘ তিন দশক স্থায়ী হলেও এ আন্দোলন শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল-

প্রথমত, বিপ্লবীদের কর্মকান্ড গোপন হওয়ায় এর লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনমনে অজ্ঞতার কারণে জনগণের সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। ফলে ভারতবাসী স্বাধীনতা চাইলেও এই আন্দোলনের সঙ্গে ব্যাপক জনগনকে যুক্ত করা যায়নি।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপে এসময় গড়ে ওঠা জাতীয়দাবাদী আন্দোলনে সংকীর্ণতা ছিলনা। কিন্তু সশস্ত্র আন্দোলনে সংকীর্ণতা প্রবলভাবে ছিল। বিশেষ করে হিন্দু সভ্যতা ও ধর্মের আধিক্য থাকায় মুসলমানরা আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। তাছাড়া তখনো পর্যন্ত মুসলমান সমাজের মধ্যে অগ্রসর শিক্ষিত যুব সমাজ তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি যেমনিভাবে হিন্দু সমাজের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। তাই বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন মুসলমান তরুণ সশস্ত্র ধারার আন্দোলনে যুক্ত হলেও উল্লেখযোগ্য অংশই সম্পৃক্ত হয়নি। তাছাড়া বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত থাকায় এটি গুটি কয়েক হিন্দু যুবকদের সমিতিতে পরিণত হয়। কালী মন্দির বা মূর্তির কাছে দীক্ষার পদ্ধতিও মুসলমানদের আকৃষ্ট করেনি।

তৃতীয়ত, বিক্ষিপ্ত ও স্থানীয় পর্যায়ের এ আন্দোলনগুলো কখনোই কেন্দ্রীয়ভাবে শক্তিশালী হয়নি। ফলে ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে বৈপরীত্য সংগঠনকে দুর্বল করে দেয়।

চতুর্থত, অপ্রতুল আধুনিক অস্ত্র ও ট্রেনিং-এর অভাব ব্যর্থতার প্রধান কারণ। অস্ত্র বলতে ছিল বন্দুক ও বোমা। এগুলো দিয়ে মাঝে মাঝে তারা সফল হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। ইংরেজদের মধ্যে যাদেরকে তারা টার্গেট করেছিল, তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যককেই তারা মারতে পেরেছিল। বরং সন্ত্রাসীদের মৃত্যুর সংখ্যাই বেশি ছিল।

পঞ্চমত, ব্রিটিশ সরকারের কঠোর দমননীতি বিপ্লবীদের স্তিমিত করে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয়রাও ইংরেজদের সাহায্য করে।

ষষ্ঠত, রাজনৈতিক দল বহির্ভূত এ সংগঠনগুলো তরুণ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে প্রসার ঘটাতে পারেনি। সরকারি হিসেবে ১৯০৭-১৭ সাল পর্যন্ত অভিযুক্তদের ১৮৬ জনের মধ্যে ৬৮ জনই ছিলেন ছাত্র। বাকীরা সবাই তরুণ।

সপ্তমত, গুপ্ত সমিতিগুলোর সাংগঠনিক ব্যর্থতা ছিল প্রবল। একমাত্র অনুশীলন সমিতি ছাড়া বেশির ভাগ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকায় বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা নেয়া হতো। শুধু পরিকল্পনার অভাবে বেশির ভাগ অভিযান পরিচালিত হয়েছে অপরিকল্পিত ও তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে।

অষ্টমত, গুপ্ত সমিতি পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল পরিমান অর্থের। অর্থ সংগ্রহে তাদের প্রধান উপায় ছিল টাকা লুট বা ডাকাতি করা। ডাকাতির দিকেই সমিতিগুলো বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়ে। ফলে জনগণ সাধারণ ডাকাতদের মতোই মনে করে অনেক সময় তাদের ধাওয়া করতো, ধরে পুলিশে দিয়ে দিত।

পরিশেষে, এই সমিতিগুলোর জনবিচ্ছিন্নতা এর ব্যর্থতার প্রধান কারণ। বেশিরভাগ বিপ্লবীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের হিন্দু। সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের সঙ্গে তাদের তেমন সম্পর্ক ছিল না। বিপ্লবীরা তাদের কর্মকান্ডের আওতায় কৃষকদের আনতে পারেনি যারা ঐ সংকটে তাদের সহায়তা করতে পারত।

ঘ. আন্দোলনের গুরুত্ব

এই আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এর পরোক্ষ ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। বিপ্লবীদের স্বদেশ প্রেম, আত্মত্যাগ সাধারণ দেশবাসীর মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চার করে, অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকবর্গের মনে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি এই সশস্ত্র আন্দোলনই ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবাসীর জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রদানে বাধ্য করে। ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে যার ভিত্তিতে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সশস্ত্র আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলে অনেক বিপ্লবী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন, বিপ্লবী মার্কসবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। সন্ত্রাসবাদের প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে তারা গণবিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। অনেকে কারাগারে বসে মার্কসবাদী আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেন যা পরবর্তী সময়ে বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্র তৈরি করে।

সারসংক্ষেপ

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের পরিণতিতে বাংলায় যে সশস্ত্র আন্দোলনের সূত্রপাত হয় অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতির মাধ্যমে তা এগিয়ে যায়। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশীয় শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষে অসংখ্য তরুণকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা হয়। বহু সরকারি কর্মকর্তা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে হত্যা করে বিপ্লবীরা ব্রিটিশদের মনে এক ধরনের ভীতি সৃষ্টি করেন। যদিও প্রধানত সমন্বয়ের অভাব, জনবিচ্ছিনতা, অস্ত্রের অপ্রতুলতা এবং বিপ্লববাদী আন্দোলনের ধ্যান-ধারনা ও অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়। স্বীকার করতে হবে এই আন্দোলন স্বাধীনতাকে তরান্বিত করেছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। মুনতাসীর মামুন 'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (১৯০০-১৯১৮)', সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঢাকায় সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য যে সমিতি গড়ে ওঠে তার নাম-
(ক) যুগান্তর (খ) ব্রতী সমিতি
(গ) সুহৃদ সমিতি (ঘ) অনুশীলন সমিতি।

২। অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠকের নাম-
(ক) সূর্য সেন (খ) ক্ষুদিরাম
(গ) পুলিন বিহারী দাস (ঘ) প্রীতিলতা।

৩। যে ইংরেজকে হত্যার অভিযোগে ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেয়া হয় তাঁর নাম–
(ক) কিংসফোর্ড (খ) লর্ড হার্ডিঞ্জ
(গ) হাডসন (ঘ) সিম্পসন।

৪। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে নেতৃত্ব দেন-
(ক) প্রীতিলতা (খ) সূর্যসেন
(গ) বাদল গুপ্ত (ঘ) বিনয় বসু।

৫। ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে হত্যার দায়ে ফাঁসি হয়-
(ক) বাদল গুপ্ত (খ) বিনয় বসু
(গ) দীনেশ গুপ্ত (ঘ) সূর্য সেন।

৬। চট্টগ্রাম ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দান ও আত্মঘাতী নারীর নাম-
(ক) বীনা দাস (খ) প্রীতিলতা
(গ) কল্পনা বসু (ঘ) লীলা রায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনের (১৯১১-৩৪) কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনের (১৯১১-৩৪) গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৩। সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতির কর্মকান্ড সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। বাংলার সশস্ত্র আন্দোলন (১৯১১-১৯৩৪) সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

অবিভক্ত বাংলায় প্রাদেশিক সরকার (১৯৩৭-১৯৪৭)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *বঙ্গীয় আইনসভার গঠন ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *এ.কে. ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার (১৯৩৭-৪১) গঠন ও কার্যক্রম আলোচনা করতে পারবেন;*
- *এই মন্ত্রিসভার সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *এ.কে. ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার (১৯৪১-৪৩) গঠন ও কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে পারবেন;*
- *এই মন্ত্রিসভার সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভার (১৯৪৩-৪৫) গঠন ও কার্যক্রম আলোচনা করতে পারবেন;*
- *এর সীমাদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভার (১৯৪৬-৪৭) গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *এই মন্ত্রিসভার সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।*

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মূলত দায়িত্বশীল সরকার ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ভারতবাসী আন্দোলন চালিয়ে যায়। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে প্রথম প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত হয় এবং পরের বছর থেকে নির্বাচনের তৎপরতা শুরু হয়। এই আইনের আওতায় ১৯৩৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭-৪৭ সাল সময়ে বাংলায় মোট চারটি মন্ত্রিসভা ছিল- ১. ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-৪১), ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-৪৩), নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভা (১৯৪৩-৪৫) এবং সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভা (১৯৪৬-৪৭)। ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই এক দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল। এই সময়ে (১৯৩৭-৪৭) বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের উত্থান, বিকাশ এবং পাকিস্তান আন্দোলনের বিস্তার ঘটে। পরিণামে ব্রিটিশ সরকার এ যুগের শেষের দিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। এ সিদ্ধান্তের ফলে এদেশে দু'শো বছরব্যাপী বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

ক. বঙ্গীয় আইনসভার গঠন ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ

ব্রিটিশরা সর্বপ্রথম তাদের দেশের আদলে এদেশেও একটি শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার মাধ্যমে সরকার পরিচালনার পদ্ধতি চালু করে। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্টের অধীনে প্রবর্তিত চার সদস্য বিশিষ্ট গভর্নর জেনারেল এ্যান্ড কাউন্সিল'কে পরবর্তীকালের আইনসভা এবং বর্তমানকালের জাতীয় সংসদের ভ্রূণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। আলোচনা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে কাউন্সিল রেগুলেশন পাশ করত। ১৭৮৪ সালের পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্টের মাধ্যমে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নাম রাখা হয় 'গভর্নর জেনারেল এ্যান্ড কাউন্সিল'। ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করার জন্য কাউন্সিলে একজন আইন সদস্য নিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৭৫ সালের মহাবিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে ১৮৫৮ সালে রানি ভিক্টোরিয়া শাসন ক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে নিজ হাতে তুলে নেন। ফলে পুলিশী রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান ঘটে। পরিবর্তিত ব্রিটিশ নীতির আলোকে আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তির লক্ষে ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত হয়। এর মাধ্যমে গভর্নর জেনারেলকে কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ছয় থেকে বারজন সদস্য নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে (১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২) খান বাহাদুর আবদুল লতিফসহ চারজন বাঙালি ছিলেন, যাদের সবাই ছিলেন রাজ অনুগত। ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের অধীনে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য সংখ্যা তেরো জনের স্থলে একুশ জন করা হয়। তবে এতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের কোনো বিধান রাখা হয়নি। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে বঙ্গীয় আইনসভায় জনগণের সাধারণ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১১৪ নির্ধারণ করা হয়। এতে আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু প্রাদেশিক গভর্নরকে যে কোন বিলে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৯২০ সালে স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন না হলেও ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু ১৯২৫ সালে পার্টি তথা আইনসভার প্রভাবশালী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস পরলোকগমন করলে আইনসভার কার্যক্রম জনস্বার্থের জন্যে পুরোপরি অনুকূল হতে পারেনি।

১৯২৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের সাংবিধানিক সমস্যা সুষ্ঠু সমাধানকল্পে জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি মিশন প্রেরণ করে। স্বরাজ পার্টি ঐ কমিশন প্রত্যাখ্যান করে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার আইনসভার স্বরাজ পার্টিভুক্ত সকল বিরোধী সদস্যকে প্রভাবিত করে সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। ১৯২৮ সালের ৩১ জুলাই তারিখে আইনসভায় স্যার আবদুর রহিম কমিশনকে লক্ষ করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনসহ সাত দফা সম্বলিত একটি দাবিনামা পেশ করেন। প্রস্তাবটি বঙ্গীয় আইন সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।

মূলত ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং ১৯৩২ সালে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে ব্রিটেনে জাতীয় সরকার গঠিত হলে তাদের নীতিতে কিছুটা পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। এই দল ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারে বিশ্বাসী ছিল বলে নতুন শাসনতান্ত্রিক সুপারিশ করে এবং ঐ বছরই সম্প্রদায়গত পদক (Communal Award) ঘোষণা করা হয়। তারা মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনাধিকার গ্রহণ করে এবং বিধান পরিষদগুলিতে সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদ অনুযায়ী দেশে শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করলে প্রদেশসমূহে দ্বৈতশাসন প্রথা বিলুপ্ত হয়। এ আইনে পৃথক নির্বাচন প্রথা, কেন্দ্রে ফেডারেল সরকার ও প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয় এবং প্রদেশসমূহের ক্ষমতা পুনর্নিধারণ ও ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ফলে এ দেশীয়দের কাছে প্রাদেশিক পর্যায়ে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন করা হয়। এ ছাড়া রেসিডুয়ারী বা

বিশেষ সংরক্ষিত ক্ষমতা প্রদেশ বা কেন্দ্রের হাতে না দিয়ে স্বয়ং ভাইসরয়কে এবং প্রাদেশিক বিষয়গুলি মন্ত্রিসভার নিকট হস্তান্তরিত হয়। নতুন শাসন সংস্কারের ফলে ভোটাধিকার অনেক সম্প্রসারণ হয়। ১৯৩৫ সনের আইন ১৯১৯ সনের অপেক্ষা নিঃসন্দেহে অনেক উন্নত প্রাগ্রসর ছিল। কিন্তু প্রাদেশিক গভর্নর ও কেন্দ্রে ভাইসরয়ের হাতে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়ার ফলে গণতন্ত্র অনুযায়ী প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার গঠন অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

খ. ১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও ফলাফল

১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল হতে নতুন আইন কার্যকরী করা লক্ষে ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাস থেকেই নির্বাচনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। কৃষক পার্টি, মুসলিম লীগ মূলত এ নির্বাচনে বেশি তৎপরতা দেখায়। এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টি আত্মপ্রকাশ করে। এ দলের ১৪ দফা নির্বাচনী কর্মসূচিতে- ১. জমিদারি উচ্ছেদ, ২. মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ, ৩. ঋণ সালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠা, ৪. বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, ৫. পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ৬. মন্ত্রীদের বেতন ১০০০ টাকায় হ্রাস, ৭. রাজবন্দিদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি প্রাধান্য পায়। নির্বাচনের প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দীর ইউনাইটেড মুসলিম লীগ ও মুসলিম লীগের সমন্বয়ে বাংলার মুসলিম লীগ সংগঠিত হয়। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকরী করতে সাহায্য করা এবং দেশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জনের কথা মুসলিম লীগের নির্বাচনী কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কংগ্রেসসহ এই তিনটি দল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও ১৯৩৭ সালের নির্বাচন মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টির মধ্যে প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়। নির্বাচনে অসাম্প্রদায়িক কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর দল মুসলিম লীগ- এই দুই দলের পার্লামেন্টারি প্রতিযোগিতা হলেও এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে ১১৯টি সংরক্ষিত আসনে মুসলিম লীগ ৪০টি, কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৮টি ও স্বতন্ত্র মুসলমানরা ৪১টি আসন পায়। সাধারণ আসনের মধ্যে কংগ্রেস পায় ৬০টি। বাকি আসন পায় অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র পার্টি। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। বাংলায় মুসলিম লীগের নির্বাচনে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার বেশ কিছু কারণ ছিল-

প্রথমত, তাদের প্রার্থীরা প্রজা পার্টির থেকে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ছিলেন এবং নির্বাচনী প্রচারের জন্য লীগের নিজস্ব তহবিল ছিল;

দ্বিতীয়ত, মুসলিম পত্র-পত্রিকা যেমন-দৈনিক আজাদ, Star of India মুসলিম লীগের পক্ষে মুসলিম সংহতির জন্য প্রচারণা চালায়। ফলে অনেক কৃষক-প্রজা নেতা মুসলিম সংহতির প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করে লীগে যোগদান করেন;

তৃতীয়ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হতে যে শিক্ষিত সচেতন মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-সমাজের সৃষ্টি হয়, তারাই বাংলার রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। সর্বোপরি ছিল মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সেক্রেটারী জেনারেল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাংগঠনিক প্রতিভা ও নিঃস্বার্থ কর্মপ্রেরণা।

পক্ষান্তরে কৃষক-প্রজা পার্টির নিজস্ব কিছু সুবিধা ছিল-

প্রথমত, কৃষক-প্রজা পার্টির প্রধান মূলধন ছিল এ.কে. ফজলুল হকের ব্যক্তিগত আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা;

দ্বিতীয়ত, ফজলুল হক সাধারণ জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব বুঝতেন বলেই কিছু জন-সম্পৃক্ত কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তার কয়েকটি হলো- জনগণের জন্য দু'বেলা 'ডাল-ভাতের ব্যবস্থা' করা, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ, খাজনা হ্রাস, সেলামি বন্ধ, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, পাটের ন্যায্য মূল্য, মুসলমানদের চাকরিতে ন্যায্য অংশ আদায় প্রভৃতি;

তৃতীয়ত, লীগ নেতাদের তুলনায় প্রজা পার্টির প্রার্থীদের জনসংযোগ ছিল অনেক বেশি, যেহেতু লীগের অধিকাংশ প্রার্থী ছিলেন উচ্চবিত্ত শ্রেণীর।

এ সমস্ত কারণে কৃষক-প্রজা পার্টি নির্বাচনে পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিপুল সংখ্যায় জয়ী হয়। পরবর্তীসময়ে ৩৭ জন স্বতন্ত্র সদস্যের মধ্যে ২১ জন মুসলিম লীগে এবং ১৬ জন কৃষক-প্রজা পার্টিতে যোগদানের ফলে পরিষদে কংগ্রেসের ৬০ সদস্যের পাশাপাশি লীগ ও প্রজা পার্টির সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৯ ও ৫৫ জন। এই নির্বাচনে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো লীগের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা এবং অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি খাজা নাজিমুদ্দিন চ্যালেঞ্জ জানিয়েও নিজের জমিদারী পটুয়াখালীতে হক সাহেবের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এতে একদিকে হক সাহেবের অভাবনীয় জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব হ্রাস পায় এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

গ. ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন ও এর কার্যক্রম (১৯৩৭-১৯৪১)

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কোন একক রাজনৈতিক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম না হওয়ায় একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলমান সদস্যরা বেশ ঐক্যবদ্ধ থাকে, সে জন্য মুসলমান জনমতের প্রচন্ড চাপ থাকা সত্ত্বেও ফজলুল হক প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে তা সফল হতে পারেনি। ফজলুল হকের এ সিদ্ধান্তে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। ফলে কালবিলম্ব না করে তাঁর নেতৃত্বাধীনে একটি মন্ত্রিসভা গঠনে তাদের সম্মতি ও সক্রিয় সহযোগিতা দানের কথা ব্যক্ত করলে ফজলুল হক ও তাঁর দল এটি গ্রহণ করেন। সন্দেহ নেই, জিন্নাহ্‌র এই কৌশলগত চাল বাংলার রাজনীতিতে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

বাংলায় গভর্নর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথমে কংগ্রেসের বাংলার সভাপতি শরৎ বসুকে আহ্বান জানিয়ে সাড়া না পেয়ে ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনে আমন্ত্রণ জানান। প্রায় তিন সপ্তাহ সময় নিয়ে ফজলুল হকের পক্ষে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয়। এই মন্ত্রিসভায় ৬ জন ছিলেন মুসলমান এবং ৫ জন হিন্দু (৩ জন বর্ণ হিন্দু ও ২ জন তফসিলী হিন্দু)। কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় যোগ না দেয়ায় হিন্দু সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ করে ব্যাপক হিন্দু মধ্যবিত্তের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল ছিল না। ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন জমিদার, ১ জন পুঁজিপতি এবং ৪ জন আইনজীবী-রাজনীতিবিদ ছিলেন। নির্বাচনী এলাকা বিচারে ৩ জন বিশেষ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি, ২ জন জমিদার এসোসিয়েশন এবং ১ জন চেম্বার অব কমার্স এবং বাকি ৮ জনের মধ্যে ৪ জন শহর এলাকা থেকে নির্বাচিত ছিলেন।

১৯৩৭ সালে মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার কিছুদিন পরই মন্ত্রিসভার স্থিতিশীলতা ও সংহতির জন্য ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং এর সভাপতি নির্বাচিত হন। মন্ত্রিসভার মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হন দলের সাধারণ সম্পাদক। ফলে একই সঙ্গে দুই দলের সভাপতি পদে

থাকলেও একসময় কৃষক-প্রজা পার্টি প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে হক মন্ত্রিসভা অনেকটা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা হয়ে ওঠে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও হক মন্ত্রিসভা বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারে-

১. ১৯৩৮ সালের ৫ নভেম্বর ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে চেয়ারম্যান করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হয়, যা 'ফ্লাউড কমিশন' নামে পরিচিত। ১৯৪০ সালের ২১ মার্চ কমিশন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করার সুপারিশসহ রিপোর্ট পেশ করে। পরবর্তীকালে (১৯৫০ সালে 'পূর্ববাংলা প্রজাস্বত্ব অধিগ্রহণ আইন' পাশের মাধ্যমে) এই রিপোর্টের ভিত্তিতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা হয়।

২. ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় চাষী খাতক আইনের আওতায় সমগ্র বাংলা প্রদেশে বহু সংখ্যক 'ঋণ সালিসী বোর্ড' গঠিত হয়। এই বোর্ড ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বাংলার কৃষকের ঋণভার লাঘবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলার সরকারি চাকরি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের একচেটিয়া দখলে। ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় চাকরি নিয়োগ বিধি প্রবর্তন করে হক মন্ত্রিসভা কর্তৃক চাকুরিতে নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে প্রণীত সম্প্রদায়ভিত্তিক বন্টনবিধির অধীনে ৫০% পদ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। এ নিয়োগনীতির যথার্থ তদারকি করার জন্য একজন বিশেষ কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। এ ছাড়া মুসলমানদের প্রতি মন্ত্রিসভার সাধারণ পক্ষপাতিত্ব যে ছিল- তা বলাই বাহুল্য।

৪. ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় মহাজনী আইন পাশ করে সরকার সকল মহাজনদের জন্য ট্রেড লাইসেন্স থাকা অত্যাবশ্যকীয় করে। এ ছাড়া সুদের হারও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ সব আইন কৃষকদের এক বৃহদাংশকে 'ভয়াবহ ঋণের বোঝা এবং মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার ও মহাজনদের বিভিন্ন প্রকার অবৈধ আদায়' থেকে মুক্তি দেয়।

৫. ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন পাশ করে জমিদারদের দেয় জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত ফি, জমিদারদের জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার (Pre-emption), সার্টিফিকেট প্রথার মাধ্যমে খাজনা আদায় এবং চাষীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ আদায় বা 'আবওয়াব' প্রভৃতি বাতিল করা হয়। কুড়ি বছর সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগে মাত্র চার বছরের খাজনা পরিশোধ করে চাষীরা সিকস্তি জমি পুনরুদ্ধারের সুযোগ লাভ করে। বকেয়া খাজনার ওপর ধার্যকৃত সুদের হার ১২.৫% থেকে কমিয়ে ৬.২৫% স্থির করা হয়। এই আইনে জমিদারদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের ও পর্যায়ের স্বত্ত্বাধিকারীদের ওপর খাজনা বৃদ্ধি দশ বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়। অবশ্য এই আইন পাশের পূর্বে বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।

৬. ১৯৪০ সালে দোকান কর্মচারী আইন পাশ করে হক মন্ত্রিসভা শ্রমিকদের সপ্তাহে একদিন বন্ধ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে।

৭. পল্লী পুনর্গঠনে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে হক মন্ত্রিসভা ব্যাপক ভূমিকা রাখে। পল্লী পুনর্গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করা ও প্রচারাভিযানের জন্য জেলায় জেলায় অফিসার ও ৬০০ থানা কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। কৃষি, সেচ, রাস্তা, সেতু ইত্যাদি উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিটি গ্রামে একটি বয়স্ক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও মুষ্টি ভিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা করা হয়। এছাড়া মন্ত্রিসভা পল্লীর জনস্বাস্থ্য উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

৮. প্রধানমন্ত্রীত্বের পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয় হাতে রেখে এ.কে. ফজলুল হক বাংলা প্রদেশের শিক্ষা বিস্তারে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। হক মন্ত্রিসভার আমলে তেজগাঁও কৃষি ইনস্টিটিউট (বর্তমান শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়), কলকাতা লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ, আদিনা ফজলুল হক কলেজ সহ অসংখ্য স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লী অঞ্চলে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বয়স্কদের জন্য অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়া এ সময়কালে প্রাথমিক শিক্ষা আইনানুসারে স্কুল বোর্ড গঠন ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের জন্য বিল আনীত হয়।

৯. হক মন্ত্রিসভার অন্যান্য কৃতিত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি। এর ফলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বাংলার বহু বিপ্লবী ছাড়া পায়। এ ছাড়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ণ সহযোগিতায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌলার নামে কলঙ্ক স্থাপনকারী 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণ করা হয়।

ঘ. ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার সীমাবদ্ধতা

প্রথমত, কৃষক-প্রজা পার্টি নির্বাচনী কর্মসূচিতে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি দিলেও তাঁর মন্ত্রিসভার ১১ জনের মধ্যে ৬ জনই জমিদার ছিলেন। সে কারণে কৃষক-প্রজার প্রতিনিধিত্ব ছিল কম। তাই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত, হিন্দু আধিপত্যের যুগে হক মন্ত্রিসভায় ছিল মুসলমানদের প্রাধান্য এবং এ কৃতিত্ব ক্রমশ মুসলিম লীগের পক্ষে যায়। এমন কি কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতার মোকাবেলা করতে ফজলুল হক মুসলিম লীগের মতো সাম্প্রদায়িক অবস্থান নেন। ফলে কৃষক-প্রজা দল জনপ্রিয় হলেও মুসলিম লীগকে কেন্দ্র করে ক্রমান্বয়ে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এ সুযোগে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হলে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা ও শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় জিন্নাহ ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাশালী হয়ে প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করলে প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়। ১৯৪০ -৪১ সালে কেন্দ্রের সঙ্গে বাংলা প্রদেশে মুসলিম লীগের বিরোধ দেখা দেয় এবং জিন্নাহ ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কার করে। মুসলিম লীগ সদস্যরা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলে সাংবিধানিক সংকটে পড়েন ফজলুল হক। এ অবস্থায় ১৯৪১ সালে তিনি পদত্যাগ করেন এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রোগ্রেসিভ পার্টি গঠন করেন।

ঙ. ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন ও কার্যক্রম (১৯৪১-৪৩)

প্রথম হক মন্ত্রিসভার পতনের পর পুনরায় ফজলুল হকেরই নেতৃত্বে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা দুই পর্যায়ে গঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে আংশিকভাবে ১৯৪১ সালের ১১ ডিসেম্বর এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আংশিকভাবে গঠিত হয় ১৮ ডিসেম্বর।এর পূর্বে খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীনে একটি মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং নবঘোষিত প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির ডেপুটি লিডার ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর গ্রেফতার- এই দুই কারণে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন বিলম্বিত হয়। গভর্নর হার্বাট শেষ চেষ্টা হিসেবে মুসলিম লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি যুদ্ধকালীন কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু জিন্নাহর অসম্মতির কারণে তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সুস্পষ্ট সমর্থন থাকায় এ.কে. ফজলুল হককে শেষপর্যন্ত সরকার গঠনের আহ্বান জানানো হয়।

হকের নতুন মন্ত্রিসভা বিভিন্ন দলের সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। মন্ত্রিসভায় শপথ গ্রহণের দিনই সম্ভাব্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শরৎ বসুর গ্রেফতার হক সাহেবের জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় হলেও তাঁকে বাদ দিয়ে তিনি পরিস্থিতি মেনে নিতে চেষ্টা করেন। অবশ্য বঙ্গীয় কংগ্রেস এতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে। মন্ত্রিসভায় হক সাহেবের পাঁচ জন মুসলিম ও চারজন হিন্দু মন্ত্রী স্থান পেলেন। তাঁদের মধ্যে হিন্দু মহাসভার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী নাম উল্লেখের দাবি রাখে যিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন। সে জন্য এই মন্ত্রিসভাকে কেউ কেউ 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা নামে অভিহিত করেন। মন্ত্রিসভার এরূপ গঠন দেখে গভর্নর জেনারেল লিনলিথগো'র অভিমত হলো- এটি খুবই লক্ষণীয় বিষয় হবে যদি এ মন্ত্রিসভা নয় বা বার মাস একত্রে থাকতে পারে। আর মুহম্মদ আলী জিন্নাহ উপহাস করে বলেন, "ভাইসরয়কে বড়দিনের উপহার দিলাম ফজলুল হককে, বাংলার গভর্নরকে নববর্ষের উপহার দিলাম ঢাকার নবাবকে।" মুসলিম লীগ আইনসভায় বিরোধী দল গঠন করে, দলের নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন মূলত সোহরাওয়ার্দী বিরোধী রাজনীতির প্রধান নেতা।

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা মাত্র ৪৭৫ দিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ঐ সময়ে প্রতিটি মুহূর্ত তাঁকে কাটাতে হয়েছে মুসলিম লীগের বিরোধিতার মুখে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মন্ত্রিসভা উল্লেখযোগ্য কোন অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ পুরোদমে সক্রিয় হয়ে দলের ভিত্তি সুদৃঢ় করে গড়ে তোলে।

তবে ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার কৃতিত্ব কিছুটা হলেও একটা দিকে ছিল। তা হলো, এমন ধরনের মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে ফজলুল হক বাংলার রাজনীতি অঙ্গনে এক নতুন ধারার সূচনা করেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের প্রয়াস নেন। এর দ্বারা তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর পূর্বেকার অবস্থান থেকে সরে আসেন। তবে উদ্যোগটি মহৎ হলেও তা ছিল অতি বিলম্বিত, ইতোমধ্যে 'কায়েদে আজম'-এর উত্থান ঘটেছে; সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করেছে, পাকিস্তান পরিকল্পনা মুসলিম লীগের মূল আদর্শে পরিণত হয়েছে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটেছে, মুসলমান জনসাধারণের মনে সর্বভারতীয় মুসলিম সংহতির ধারণা ভিত্তি লাভ করেছে। বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভার বিভিন্ন কার্যক্রমের দ্বারা উপকৃত হয়ে নিজেদেরকে মুসলিম লীগের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে।

চ. ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার সীমাবদ্ধতা

প্রথমত, এই মন্ত্রিসভায় অখন্ড হিন্দুস্থানে বিশ্বাসী হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন নিখিল ভারত হিন্দুসভার কার্যকরী সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অন্তর্ভুক্তি ছিল ফজলুল হকের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্বস্তিকর। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (যার দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায় আইনসভায় পূর্বাপেক্ষা বেশি আসন লাভ করে)-এর বিপক্ষে আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন অগ্রনায়ক। হকের মন্ত্রিসভার আমলে চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য কোটা নির্ধারণ, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন (সংশোধন) বিল ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিল-এর চরম বিরোধিতা এবং ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন সময়ে তাঁর ভূমিকা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে। ফলে তিনি তাঁদের কাছে একজন কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন। তাছাড়া মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তির কিছু দিন

পূর্বে হক সাহেবও তার সমালোচনায় মুখর ছিলেন। ফলে মন্ত্রিসভায় শ্যামাপ্রসাদের অন্তর্ভুক্তি হকের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলতে মুসলিম লীগের নেতাদের চমৎকার সুযোগ এনে দেয়।

দ্বিতীয়ত, বাংলার মতো একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পর ক্ষমতাচ্যুত হওয়া মুসলিম লীগের নিকট ছিল উৎকণ্ঠার ব্যাপার। সেজন্য তারা জনসাধারণের নিকট জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হককে জনবিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। এই লক্ষে সোহরাওয়ার্দী, নাজিমুদ্দিন ও তমিজদ্দিন খানের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী টিম প্রদেশব্যাপী গণসংযোগে বের হয় এবং কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় সাত-আটশ জনসভা করেন। এ ছাড়া দৈনিক আজাদ, স্টার অব ইন্ডিয়া, দি মর্নিং নিউজ ইত্যাদি পত্রিকা হক বিরোধী প্রচারণায় সামিল হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক উদ্দীপ্ত বাংলার মুসলমান ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায়। ফলে মুসলিম লীগ তাদের উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়। হক সাহেব দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে থাকেন।

তৃতীয়ত, লীগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফজলুল হককে তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার ওপরে নির্ভর করতে হয়। যোগ্য নেতা হওয়া সত্ত্বেও শুধু দুর্বল সাংগঠনিক ক্ষমতার কারণে তিনি কৃষক-প্রজা দলকে গড়ে না তুলে মুসলমানদের সমর্থন পুনরুদ্ধারের জন্য প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগ নামে একটি সাম্প্রদায়িক দল গড়ে তোলেন। কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের একটি অংশ মুসলিম লীগ নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হওয়ায় তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন। এভাবে ঘন ঘন দল গঠন ও পরিবর্তন করার বিষয়টি তাঁর রাজনৈতিক পতনকে ত্বরান্বিত করে।

চতুর্থত, ফজলুল হক বাংলার গভর্নর জন হার্বাট থেকে শুরু করে মহকুমা অফিসার পর্যন্ত সর্বস্তরের আমলাদের প্রতিকূল মনোভাবের মুখে পড়েন। ফলে এক সময় ভাইসরয়ের নিকট তিনি গভর্নরের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন। স্পষ্টত গভর্নরের সাথে ফজলুল হকের বিরোধ প্রকট হয়। ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ ফজলুল হককে অসাংবিধানিকভাবে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়, যা ছিল বরখাস্তের নামান্তর মাত্র। কারণ আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন তখনো তাঁর প্রতি ছিল।

ছ. নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভার গঠন ও কার্যক্রম (১৯৪৩-৪৫)

এ. কে. ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার পদত্যাগের সময় গভর্নর একটি সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের ধারণা দিলেও ভারতীয় রাজনীতির বিশেষ প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানানো হয়। ১৯৪৩ সালের ২৩ এপ্রিল নাজিমুদ্দিন ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মুসলিম লীগের তরুণ নেতা ও ছাত্র সমাজের ইচ্ছা ছিল দলের মূল সংগঠক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী হবেন। কারণ হক সাহেবের পরে তিনিই ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে যোগ্যতম নেতা। আইনসভায় হিন্দুদের আসন কম থাকায় তারা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রার্থী হতেন না। তৎকালীন রাজনীতির ধারানুযায়ী জমিদার হিসেবে খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রভাব ছিল। তাছাড়া জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলী খানের বিশ্বস্ত লোক ছিলেন বলে নাজিমুদ্দিনই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

মন্ত্রিসভায় ৩ জন বর্ণহিন্দু ও ৩ জন তফসিলী হিন্দুর সমন্বয়ে ৬ জন হিন্দু সদস্য অন্তর্ভুক্ত হলেও এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ঘটেনি। কেননা উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী বঙ্গীয় কংগ্রেসের কোন অংশই মন্ত্রিসভায় যোগদান করেননি। ফজলুল হকের পদত্যাগের প্রাক্কালে মুসলমান সদস্যরা মুসলিম লীগে যোগ দিতে থাকেন। ফলে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের সদস্য সংখ্যা রাতারাতি ৪০ থেকে ৭৯ জনে উন্নীত হয়। নাজিমুদ্দিনের পেছনে প্রতি ইউরোপীয় গ্রুপ, তফসিলী হিন্দুদের একাংশ, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও

অন্য আরো কিছু সদস্যের সমর্থন। আর গভর্নরের সমর্থনতো ছিলই। ফলে হক সাহেবের চেয়ে তিনি অনেক সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত হন।

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার দুর্ভাগ্য যে প্রদেশের প্রশাসনিক বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার পূর্বেই বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। বাংলা ১৩৫০ সালে (ইংরেজি ১৯৪৩) হয়েছে বলে তা 'পঞ্চাশের মনন্তর' নামে বিশেষভাবে পরিচিত। খাদ্যশস্যের ঘাটতি প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলে। লীগ সরকার গঠনের পর পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়। তৎকালীন বাংলা সরকার কর্তৃক 'উডহেড কমিশন' যে রিপোর্ট প্রদান করে তাতে বলা হয় যে, এই দুর্ভিক্ষের জন্য ভারত সরকার, হক মন্ত্রিসভা ও মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা সকলেই আংশিকভাবে দায়ী।

মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে এক পর্যায়ে জাপান, বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) দখল করে চট্টগ্রামের উপকূলে এসে হাজির হলে বাংলার পতন সময়ের ব্যাপার বলে মনে করা হয়। শত্রুপক্ষকে সর্বাত্মক অসুবিধায় ফেলার লক্ষে ব্রিটিশ নীতি অনুযায়ী উপকূলীয় অঞ্চল হতে খাদ্য মজুত অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়, নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল করার লক্ষে সুপরিকল্পিতভাবে দেশীয় নৌকা ধ্বংস করা হয়। তাছাড়া উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বার্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সেখান থেকে অনেক উদ্বাস্তু বাংলায় প্রবেশ করার ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। অনাবৃষ্টির ফলে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদনও হ্রাস পায়। দুর্ভিক্ষের আভাস পেয়ে ভারত সরকার সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে গুদামজাত করে রাখার ফলে খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দেয়। পাশাপাশি অসাধু ও অর্থলোভী ব্যবসায়ীরা তা মজুদ করে রাখে। এ ছাড়া দেশে কর্ডনিং প্রথা চালু ও সর্বপ্রকার মালামাল সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকার জন্য, এমন কি স্টিমার ও রেলগাড়ি বাংলার বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য খাদ্যশস্যের অবাধ চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। পাঞ্জাব সরকার বাংলার এই সংকটে গম ও আটা পাঠাতে রাজী হলেও দেশে কর্ডনিং প্রথার জন্য তা আমদানি করা সম্ভব হয়নি। হিন্দু মহাসভাপন্থী কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি বিরূপ থাকায় অন্যান্য প্রদেশ হতে খাদ্য আমদানিতে বাধার সৃষ্টি করেন। বিহার ও উড়িষ্যা সরকার তাদের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাছাড়া সরকারি আমলাদের কর্তব্যে ত্রুটি ও দায়িত্বহীনতা এবং মুদ্রাস্ফীতির জন্য পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। এই সংকটজনক মুহূর্তে খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পরিস্থিতি সামাল দিতে চেষ্টা করেন। তবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার এ দিকটায় দৃষ্টিপাত করেনি, বাংলার মানুষের জীবনের চেয়ে সাম্রাজ্য রক্ষা করা তখন তাদের নিকট বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যেও সোহরাওয়ার্দী নিজ তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জেলায় খাদ্যশস্য প্রেরণ করেন, সরবরাহ বিভাগকে তিনি জরুরি বিভাগ ঘোষণা করেন এবং অভিজ্ঞ অফিসার নিয়োগ করে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করেন। সরকারি প্রচেষ্টায় বহু লঙ্গরখানা খোলা হয় এবং নিরন্ন ও দুস্থ জনগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতা এবং অন্যান্য শহরেও রেশনিং প্রথা চালু করা হয়, লীগ সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় অনেক জীবন রক্ষা করা সম্ভব হলেও সারা বাংলায় ৩৫ থেকে ৩৮ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। দু'বছরের শাসনকালে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার চেষ্টা ছাড়া নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা আর তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করতে সক্ষম হয়নি। মাধ্যমিক শিক্ষাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার লক্ষে একটি শিক্ষা বোর্ড গঠনের প্রস্তাবসহ যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার সময় উত্থাপিত হয়েছিল পুনরায় তা উত্থাপন করা হয়। কিন্তু পূর্বের মতই হিন্দু সদস্যেদের বিরোধিতার মুখে বিলটি পাশ করা সম্ভব হয়নি।

জ. নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভার সীমাবদ্ধতা

খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁর মন্ত্রিসভায় স্বীয় সহোদর খাজা শাহাবুদ্দিনকে অন্তর্ভুক্ত করে খোদ মুসলিম লীগের অভ্যন্তরেই সমালোচনার সম্মুখীন হন। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ ছিল দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি। পঞ্চাশের মন্বন্তরের এ অবস্থার মধ্যে খাজা শাহাবুদ্দিনসহ মন্ত্রীদের স্ত্রীরা পর্যন্ত রাতারাতি ঠিকাদার বনে যায়। এসব কারণেই এই মন্ত্রিসভা তার নৈতিক ভিত্তি হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে মুসলমানদের প্রতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃষ্টপোষকতা ও আনুকূল্য প্রদর্শন এবং বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করায় হিন্দু সদস্যরা আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে তাদের সমর্থন হ্রাস পেতে থাকে। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ তারিখে বাজেট বরাদ্দের ওপর ভোটাভুটি হলে সরকার সমর্থক সদস্যরা বিরোধী শিবিরে যোগ দিলে ১০৬-৯৭ ভোটে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

ঝ. সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার গঠন ও কার্যক্রম (১৯৪৬-৪৭)

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতনের এক বছরের মধ্যে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বাংলাসহ সারা ভারতের সকল প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীনে সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন বলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের অপূর্ব নেতৃত্বে মুসলিম লীগ বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৫০ সদস্য বিশিষ্ট বঙ্গীয় আইনসভায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ১২২টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৪টি আসন লাভ করে। নির্বাচনের পর পরই সোহরাওয়ার্দী সর্বসম্মতিক্রমে লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২ এপ্রিল বাংলার নতুন গভর্নর ফ্রেডারিক বারোজ সোহরাওয়ার্দীকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান।

যদিও নির্বাচনের সামগ্রিক ফলাফলের ভিত্তিতে সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে এককভাবে মন্ত্রিসভা গঠনে কোন সমস্যা ছিল না। তিনি বাস্তব প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ নেন। কারণ প্রায় একদশক ধরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের হিন্দুরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেনি বলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। কিন্তু লীগের মধ্যে খাজা গ্রুপ এক্ষেত্রে সমর্থন দেয়নি। এমনকি কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি দলের নেতা কিরণ শংকর রায়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর দিল্লিতে কংগ্রেস এবং লীগ উভয় দলের হাই কমান্ডের সাথে আলোচনা করলেও সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। কারণ ধারণা করা যায়, এরা কেউ চাননি সর্বভারতীয় পর্যায়ে একটি রাজনৈতিক সমাধানের পূর্বে প্রাদেশিক ক্ষেত্রে বাংলার উভয় সম্প্রদায় কোন ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হোক।

অবশেষে সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল ৭ জন মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য এবং ১ জন তফসিলী হিন্দু (যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল) সদস্যসহ মোট ৮ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এতে চারজন প্রাক্তন মন্ত্রী ও চারজন খান বাহাদুর খেতাবধারী অন্তর্ভুক্ত হলেও মূলত এই মন্ত্রিসভা মধ্যবিত্ত স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে। এই পর্যায়ে খাজা গ্রুপের কোন সদস্যও ছিলেন না। কিন্তু যখন কংগ্রেসের মন্ত্রিসভায় যোগদান একদম নিশ্চিত হয়ে পড়ে তখন সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভার খাজা গ্রুপের প্রভাবশালী সদস্য ও প্রাক্তন চিফ হুইপ ফজলুর রহমান অন্তর্ভুক্ত হন এবং অপর সদস্য নুরুল আমীন হন স্পিকার। ১৩ জন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির মধ্যে অন্তত ৫ জন এই গ্রুপ থেকে নেয়া হয়।

ঞ. সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার সীমাবদ্ধতা

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার শুরু থেকেই খাজা-সমর্থকদের মালিকানাধীন তিনটি প্রভাবশালী পত্রিকা দৈনিক আজাদ, স্টার অব ইন্ডিয়া এবং দি মর্নিং নিউজ শীতল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে এবং সময় বিশেষে প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করে। মন্ত্রিসভার সমর্থনে জনমত গঠনে একমাত্র আবুল হাশিমের সাপ্তাহিক মিল্লাত কিছুতেই প্রয়োজনোপযোগী ছিল না।

১৫ মাসে ক্ষমতায় থেকেও সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা উল্লেখযোগ্য কোন আইনগত বিধান রচনা করতে পারেনি। এ সময় বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন নামে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন চলছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভা কর্তৃক বঙ্গীয় আইন সভায় 'বেঙ্গল বর্গাদার (প্রভিশনাল) কন্ট্রোল বিল' নামে একটি বিল উপস্থাপন করা হলে লীগের জোতদার সদস্যদের বিরোধিতার কারণে তা ব্যর্থ হয়। বাংলার কৃষক অসন্তোষের মূলে ছিল জমিদারী প্রথা। ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার আমলে গঠিত ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করার বিষয়টি ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আইনসভায় তোলা হলেও বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তা আইনে পরিণত হতে পারে নি।

প্রকৃতপক্ষে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার কার্যকাল বাংলা ও ভারতের ইতিহাসে ছিল খুবই ঘটনাবহুল। ভারত থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান, দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে এই অধ্যায়ের রাজনীতি আবর্তিত হয়। বিশেষ করে ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে ভয়াবহ 'কলকাতা দাঙ্গা' সংঘটিত হয়, যা সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার ভাবমূর্তি নষ্ট করে। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়, এবং ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সারসংক্ষেপ

১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত চারটি মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন হলেও ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা ছাড়া কোন মন্ত্রিসভা গুরুত্বপূর্ণ কোন আইন প্রণয়ন করতে পারেনি। অন্যান্য মন্ত্রিসভার সময় ছিল স্বল্প এবং উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবেলায় পুরো সময়ই ব্যয় করতে হয়। হিন্দুদের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ, মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের স্বার্থপরতা, বাংলার অবাঙালি নেতৃত্বের ষড়যন্ত্র, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বাঙালি নেতৃবৃন্দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ- এই মন্ত্রিসভাগুলোর দীর্ঘস্থায়িত্বের অন্তরায় ছিল। কৃষক-প্রজা পার্টি রাজনীতিতে যে অসাম্প্রদায়িক ধারা দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করার ফলে সেই সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায়। এতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক যে কোন সময়ের চেয়ে অবনতির দিকে চলে যায়। শেষ মুহূর্তে উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত নেতৃত্বের একটি অংশ যৌথভাবে স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এ উদ্যোগ ব্যর্থ হয় এবং ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলা বিভক্তির মাধ্যমে পূর্ববাংলা আবার নতুন করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের ঔপনিবেশে পরিণত হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, 'বঙ্গীয় আইন সভা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ', সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

২। হারুন অর রশিদ, 'বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা, ১৯৩৭-১৯৪৭', *পূর্বোক্ত।*
৩। সিরাজউদ্দিন আহমদ, *হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*, ঢাকা, ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৬।
৪। এম.এ.রহিম, *বাংলার মুসলামানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০২।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কৃষক-প্রজা পার্টি গঠিত হয়-
(ক) ১৯৩৪ (খ) ১৯৩৫ সালে
(গ) ১৯৩৬ সালে (ঘ) ১৯৩৭ সালে।

২। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় আইন পরিষদে মোট আসন সংখ্যা ছিল-
(ক) ২৪০টি (খ) ২৫০টি
(গ) ২৭০টি (ঘ) ৩১০টি।

৩। ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ছিল-
(ক) ৯ (খ) ১১
(গ) ১৩ (ঘ) ১৭।

৪। ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দেন-
(ক) ১৯৩৫ সালে (খ) ১৯৩৭ সালে
(গ) ১৯৩৮ সালে (ঘ) ১৯৪০ সালে।

৫। ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কৃত হয়ে ফজলুল হক যে দল গঠন করেন তার নাম-
(ক) কৃষক-প্রজা দল (খ) ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি
(গ) প্রোগ্রেসিভ পার্টি (ঘ) ফরওয়ার্ড ব্লক।

৬। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগ আসন পায়-
(ক) ১১০টি (খ) ১১৪টি
(গ) ১২৫টি (ঘ) ১২৭টি।

৭। ১৯৪৬ সালে কলকাতা দাঙ্গার সময় বাংলায় কার মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় ছিলেন-
(ক) ফজলুল হক (খ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
(গ) খাজা নাজিমুদ্দিন (ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। সংক্ষেপে বঙ্গীয় আইনসভার গঠন ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ লিখুন।
২। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল লিখুন।
৩। ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার সীমাবদ্ধতা আপনি কিভাবে চিহ্নিত করবেন?
৪। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার সীমাবদ্ধতা সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। বঙ্গীয় আইনসভার গঠন ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ১৯৩৭ সালের আইনসভার নির্বাচন ও এর ফলাফল আলোচনা করুন।

২। ১৯৩৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার মন্ত্রিসভার কার্যক্রম সংক্ষেপে পর্যালোচনা করুন।এই মন্ত্রিসভাগুলোর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করুন।

পাঠ-৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণ জানতে পারবেন;*
- *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি অবগত হবেন;*
- *মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন;*
- *পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।*

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তৎকালীন পূর্ববঙ্গে শিক্ষার যে সুযোগ উন্মোচন করে তা এদেশে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখে। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরবর্তীকালে সকল রাজনৈতিক উন্নয়নে নেতৃত্ব দেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন হতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসামান্য অবদান রয়েছে। এছাড়া সমাজ, অর্থনীতিসহ যাবতীয় কর্মকান্ডে দীর্ঘ অর্ধশতক ধরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বড় অংশ বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। গণসচেতনার মূলকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাই বলা হয় 'জাতীয় রাজনীতি ও আন্দোলনের সূতিকাগার'।

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পেছনে ঐতিহাসিক ও গবেষকরা বেশ কিছু কারণ চিহ্নিত করেছেন। এগুলো নিম্নরূপ-

১. পূর্ববঙ্গে মুসলমান শিক্ষা বিস্তার: মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষাবিমুখতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, ব্রিটিশ বিভেদ ও বৈষম্যনীতির কারণে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গের আগে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল খুবই কম। অবিভক্ত বাংলায় শিক্ষা ও শিক্ষিত সম্প্রদ্রায় ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। বঙ্গভঙ্গ পূর্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ শ্লথ গতিতে হওয়ায় শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছিল। ১৮৬১ সালে বাংলার সরকারি চাকরিতে হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬% ও ৫%। বঙ্গভঙ্গের ফলে শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় এ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বঙ্গভঙ্গের ১ বছরের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের চাকরি ক্ষেত্রে অনুপাত দাঁড়ায় ৫:১, যা ১৯১১ সালে এসে দাঁড়ায় ৪:১। বঙ্গভঙ্গের আগে কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ২০টি সাধারণ শিক্ষা কলেজ, মেডিকেল ও প্রকৌশল কলেজ থাকলেও পূর্ববঙ্গে ছিল মাত্র ৯টি। অবিভক্ত বাংলার মোট ৪৫টি কলেজের মধ্যে ৩০টি ছিল পশ্চিম বাংলায়, বাকি ১৫টি পূর্ববঙ্গ ও আসামে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের বড় অংশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যেতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ২৭,২৯০ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৭,০৮৭ জন ছিলেন পূর্ববঙ্গ ও আসামের। যদিও বঙ্গভঙ্গের ফলে এ অবস্থার অনেক উন্নতি হয়। মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ১৯০৭ সালে যেখানে প্রায় ৪০ হাজার ছিল সেখানে পাঁচ বছরের ব্যবধানে দাঁড়ায় প্রায় ৫ লক্ষ ২০ হাজার। এসব শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনার পর এদের বড় অংশ আর্থিক অসচ্ছলতা, যোগাযোগ সমস্যা ইত্যাদি কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন না। তাই নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিকে সমর্থন দেন।

২. ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: ব্রিটিশ সরকার অন্যান্য অধিভূক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে পূর্ববঙ্গে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। যা হবে বাংলার তৎকালীন গভর্নর লিটনের ভাষায় (১৯২২) "সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ সৃষ্টি করবে উচ্চ মেধাসম্পন্ন মানুষ"। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আদর্শ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় অভিহিত করে বলেন "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যা কোন দিনই হয়ে ওঠতে পারেনি তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় করবে।" প্রকৃতপক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অত্যাধিক চাপ হ্রাসও ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণ হিসেবে কাজ করে।

৩. বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ: বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। ব্রিটিশ বিভেদনীতির স্বরূপ তাদের কাছে উম্মোচিত হয়। মুসলিম তরুণদের বড় অংশ ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের জন্য মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।হতাশগ্রস্ত তরুণ মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হতে ফিরিয়ে আনতে ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লি দরবারে বঙ্গভঙ্গের রদ ঘোষণার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দেন। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের জন্য একটি সান্ত্বনা পুরস্কার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য পি.জে. হার্টগ এবং বাংলার গভর্নর ও আচার্য লর্ড লিটনও এক বক্তৃতায় মুসলমান ক্ষতিপূরণ প্রদানের দিকটি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন।

৪. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য: বিভেদ-নীতির প্রবক্তা ব্রিটিশ সরকারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল। ব্রিটিশ সরকার নিয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন তাদের সুপারিশে বলেন, পূর্ববঙ্গের মুসলিম ছাত্ররা শুধু আরবি-ফার্সি অধ্যায়নের জন্যই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে। সুচতুরভাবে পূর্ববাংলার মুসলমান ছাত্র সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে রাখার এটা ছিল ঘৃণ্য প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আরবি বিভাগের প্রধান করা হয় একজন ইউরোপিয়কে যিনি ছিলেন একজন খৃস্টান। আচার্য লর্ড লিটন প্রথম ব্যাচের উদ্দেশে বক্তৃতায় বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হবে এবং ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ কারণে প্রথম থেকেই ব্রিটিশদের প্ররোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে প্রচার করা হয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ব্রিটিশ বিভেদ নীতির একটি কৌশল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ইংরেজ কর্মকর্তা রিজলির বক্তব্য এখানে প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "ঐক্যবদ্ধ বাংলা ইংরেজদের জন্যে একটি বিপদজ্জনক শক্তি, বিভক্ত হলে বাংলা আর আমাদের তেমন বিপদে ফেলতে পারবে না।" ব্রিটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গের শিক্ষা ও চাকরির ব্যাপ্তি ঘটিয়ে খানিকটা অগ্রসর করে হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গকে চাপে রাখতে চেয়েছে। পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের চলমান সাম্প্রদায়িক সংঘাত চাঙ্গা করে নির্বিঘ্নে দেশ শাসন করতে চেয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশদের এ পরিকল্পনা পূর্ববঙ্গের মানুষের জন্য শাপে বর হয়েছিল।

খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের অবহেলিত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে তা সম্পূর্ণভাবে ধুলিস্যাৎ হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ক্ষোভ প্রশমনের জন্য ১৯১২ সালে জানুয়ারি মাসে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে আসেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ১৯০৫-১১ সালে শিক্ষা ক্ষেত্রে এ অংশে যে অগ্রগতি হয়েছে তা অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন। এই সফরের পরই তিনি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় করার সুপারিশ করেন। যদিও হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ এর বিরোধিতা করেন। ড. রাসবিহারী ঘোষের মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মানেই বাংলা ভাগ হয়ে যাবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'অবিভক্ত বাংলার দরদী হিসেবে তাঁরা একথা বলছেন। অবশ্য এই বিরোধিতা সত্ত্বেও ভাইসরয় ১৯১২ সালের ৪ এপ্রিল বাংলা সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশের আহ্বান জানান। এর ভিত্তিতে পরের মাসেই বাংলা সরকার এস. নাথালের নেতৃত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশন ঢাকায় একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও ১৯১৭ সালে প্রতিবেদনে পূর্ববঙ্গে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা তুলে ধরে। যদিও প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন অগ্রগতি হয়নি। ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাশ করা হয়। এই এ্যাক্টের আওতায় ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। ৩টি অনুষদের অধীনে ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক ও ৩টি আবাসিক হল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ছিলেন। অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বড় অংশই ছিলেন হিন্দু। ১৯৩৭ সালে এসেও একই অবস্থা বিরাজ করে। তখন মুসলমান শিক্ষার্থী ছিলেন ৩৯৫ জন এবং হিন্দু ১,৯৩৭ জন। প্রতিষ্ঠালগ্নের ৬০ জন শিক্ষকের মধ্যে শুধু ৮ জন ছিলেন মুসলমান।

গ. মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ

বঙ্গভঙ্গের আগে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হলেও তা ধীর গতিতে হয়েছে। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী বেশ কিছু ব্যাপারে হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। সাহিত্য, শিক্ষা, চাকরি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশ নীতির ফলে বঙ্গভঙ্গ পূর্ববর্তী সময়ে এসব ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা লাভে মুসলমানদের ব্যর্থতা ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের অগ্রগতির ফলে মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংহতি ও হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই দ্বন্দ্ব মুসলমানদের বাঙালি আত্মপরিচয়কে আড়াল করে মুসলমান জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, পরের বছর মুসলিম লীগ গঠনের পর হিন্দুদের বিরোধিতার ফলে মুসলিম জাতীয়তাবাদ আরো চাঙ্গা হয়। ১৯০৫-১১ সাল পর্যন্ত শিক্ষা, চাকুরি, কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতির ফলে মুসলিম মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এতোদিন অভিজাত সম্প্রদায় থেকেই শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে গ্রামীণ উদ্বৃত্ত কৃষক পরিবারকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত করে। তাই বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ পরবর্তীকালে বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্তের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শ্রেণীর একাংশের সাথে এসে যুক্ত হয় কৃষক সন্তানরাও। এভাবে বিশ শতকের গোড়ার দিকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের ফলে হিন্দু

মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। গ্রাম থেকে শুরু করে শহরে ব্যবসা, চাকুরি ও অন্যত্র হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব জন্ম দেয় সাম্প্রদায়িক সংঘাতে।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মধ্যবিত্তের বিকাশের ধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। ১৯০৫-১১ সাল পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষে শিক্ষার্থী ৩৭% বৃদ্ধি পায়, অথচ পূর্ববঙ্গে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৮২.৯% যা সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বোচ্চ। এদের মধ্যে মধ্যবিত্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ওয়াকিল আহমদ তাঁর 'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তাচেতনার ধারা' গ্রন্থে বলেছেন, উনিশ শতকে যে সমস্ত উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান ব্যক্তিত্ব সমাজ ও রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছেন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বঙ্গভঙ্গের পর শিক্ষা বিস্ত্মরের এই ধারা অব্যাহত থাকে। এছাড়া মুসলমান সংস্কারকদের প্রভাবে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা শিক্ষার পর জীবিকার নিশ্চয়তা ও ব্যবসায় সুযোগ না পেয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে এ বিষয়ে বিভিন্ন দাবি পেশ করে। বঙ্গভঙ্গকালীন সময়ে চাকুরির ও ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তা অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালায়। ১৯৩০-এর দশকে এসে তাই মুসলিম মধ্যবিত্তরাও হিন্দু নেতাদের সাথে একমত ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমেই কেবলমাত্র মুক্তি সম্ভব। যদিও স্বদেশী আন্দোলনের কারণে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সে সময় বাধাগ্রস্থ হয়- যা আর কখনো দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় ধরনের ঐক্য ঘটাতে পারেনি। তবে উভয় সম্প্রদায় স্বায়ত্তশাসনের দাবি অব্যাহত রাখে। প্রকৃতপক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের জিয়ে রাখা সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ড ক্রমান্বয়ে ভারত বিভাগের রাজনীতিকে চাঙ্গা করে তোলে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন এবং পরবর্তী এক দশক (১৯৪৭ পর্যন্ত) বাংলায় মুসলিম শাসনের ফলে নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। এসময় বিশেষ করে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার গৃহীত কর্মসূচির ফলে জমি ও কৃষিভিত্তিক জীবন থেকে উঠে আসা নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ আচার-আচরণ, পোশাকে, রাজনীতিতে, সাংস্কৃতিতে নব্য বাঙালিতে রূপান্তরিত হয়। ফজলুল হক কৃষক সমাজকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করায় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাশাপাশি মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ দ্রুত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে থাকে। অবশ্য ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন বড় অংশই ছিলেন গ্রামীণ মধ্যবিত্ত। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, কৃষক-প্রজা পার্টি যে ৩৬টি আসন পায় তার সবক'টি গ্রামে এবং মুসলিম লীগ যে ৩৯টি আসন পায় তার মধ্যে ৬টি শহরের আসনে জয়ী হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানি জাতিগত নিপীড়নের ফলে পূর্ববাংলায় বাঙালি মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নব চেতনার বীজ বপন হয় যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভাষা আন্দোলনে। অবশ্য এ পর্যায়ে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধর্মীয় সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব পরিবর্তিত হয়ে বাঙালি-অবাঙালি তথা জাতিগত মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্বে রূপ নেয়।

ঘ. মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এতদিন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা শহর ও গ্রামাঞ্চলে মুসলমানরা নিয়ন্ত্রিত হতো। সংখ্যায় কম, শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা এবং পেশায় পশ্চাতপদতার কারণে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী শুধু জমিদার ও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছিল সীমিত। মুসলমানদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের শূন্যতাও ছিল। বিশ দশকের মাঝামাঝি বাঙালি মুসলমান বলে উপমহাদেশে যে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, তার মূল স্রষ্টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ। ত্রিশের দশকে এসে দেখা যায় যে, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যায়নকারী ছাত্রদের বড় অংশ ক্ষুদ্র তালুকদার ও কৃষকের সন্তান। এভাবে বিশ-ত্রিশের দশকের মধ্যেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের উত্থানের মধ্যদিয়ে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় নিয়ামক শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। এ অবস্থা চল্লিশের দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। গ্রামীন বিত্তবানের সন্তানরা তখনো কলকাতামুখী, কারণ কলকাতাই তখন সব। ঢাকায় পড়া মানে মফস্বল পড়া- বিদ্যমান একরকম একটা মনোভাবের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্রাধিকার পায় স্বল্প সুযোগপ্রাপ্ত এবং কলকাতায় গিয়ে অধ্যায়নে অসামর্থ মুসলিম কৃষক ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরা। তারা চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের পূর্ববঙ্গে একটি বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবেও গড়ে ওঠে।

১৯৪৭ সালে নবগঠিত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে একটি শক্তিশালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভিত গড়ে ওঠে। এর প্রাণস্বরূপ বিরাজ করতে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ। ছাত্র জীবন সমাপ্ত করে এরা বিভিন্ন কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি চাকুরিতে যোগ দেয়। এদের মধ্য থেকেই গড়ে ওঠে আইনজীবী, সাংবাদিক, পেশাজীবী, মধ্যবর্তী স্তরের সকল পদে এরা নিযুক্ত হন।এদের নিয়েই গড়ে ওঠে পূর্ববঙ্গে উঠতি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। একারণেই আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পূর্ববঙ্গে নতুন প্রশাসনে বাঙালি মুসলমানের যোগ্য লোকের অভাব দেখা দেয়নি। বরং একটা ভাল 'টিম' নতুন পূর্ববঙ্গ পেয়ে যায়। সচিবালয় থেকে আদালতে কোথাও লোকের অভাব হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রজন্মের অনেকেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন বড় পদও গ্রহণ করেছেন।পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পাঁচজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন যারা ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।এছাড়া পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিসভার তিনজন গভর্নর, একজন হাইকোর্টের বিচারপতি, তিনজন উপাচার্য, একজন চিফ হুইপ, একজন স্পিকারও এ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছিলেন। উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের প্রায় অর্ধেকেই এসেছেন গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামী, জোতদার, তালুকদার এবং সমর্থ কৃষক অর্থাৎ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। অন্যরাও ছিলেন শহুরে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের সন্তান।পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত এলিট হিসেবে এরা ছিলেন গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের উর্ধ্বে। বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে তাই পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছরের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের বদলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। একারণে তারা জিন্নাহসহ উর্দুভাষীদের প্রত্যাখান করে। আর সেখান থেকেই শুরু হয় ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ প্রত্যাশার প্রচেষ্টা।

ঙ. পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা রয়েছে-

১. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভাবঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে ঢাকা শহর পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের কেন্দ্রে পরিণত হয়। হল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বক্তৃতা অনুষ্ঠানে শহরের এলিটরা অংশ নিতেন। অনেক বিদেশী বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবীর আগমনে বিশ্ববিদ্যালয় মুখরিত হতো। ১৯২৬ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকা হল, মুসলিম হল, জগন্নাথ হলে বক্তৃতা দেন। পরের বছর কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। তাঁদের বক্তৃতা শোনার জন্য শহরের সাহিত্যপ্রেমীরা ভীড় করেন। এমনি করে ঢাকার বাঙালি শিক্ষিতজনদের এক নতুন জগতে প্রবেশের সুযোগ করে দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২৬ সালে গঠিত হয় 'সাহিত্য সমিতি'। পরের বছর আবুল হুসেনের নেতৃত্বে এক বিশাল সাহিত্য সম্মেলনে এক হাজার সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী যোগ দেন। বিশের দশকের এই উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশে স্বতন্ত্র সাহিত্য শিল্প ধারা সৃষ্টি হয়। এসময় একদল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর উদ্যোগে 'শিখা' নামক সাময়িকী প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বড় অংশ ছিলেন বাম চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী। কলেজ, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-যুবকদের ওপর শিখার চিন্তা-চেতনার দ্রুত প্রসার ঘটে। এভাবে শিখা শুধু ঢাকা নয়, বাংলার মুসলমান মানসে অভূতপূর্ব প্রভাব সৃষ্টি করে।

২. সামাজিক প্রভাব: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে যে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটে এর ফলে ক্রমান্বয়ে একটি প্রগতিশীল ধারার সৃষ্টি হয়। পূর্ববঙ্গের গোড়া মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতা ভাঙতে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মন্ত্র-মুগ্ধের মতো কাজ করে। প্রথমবস্থায় সহশিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে এই অঞ্চলে অনাগ্রহ থাকলেও পরে কোনো যুক্তিই এক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা এখানে এসে বিদ্যার্জন করেছেন। সামাজিক বাধা অতিক্রম করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ ১৯২১ সালে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম.এ. ডিগ্রীধারী। এরপর ১৯২৩ সালে তিনজন মেয়ে ভর্তি হন। ১৯৩৬ সালে ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে ৩৯ ও পরের বছর ৫৯-এ উন্নীত হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে ছাত্রী সংখ্যা ১০০ জনে উন্নীত হয়। অবশ্য এদের বড় অংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের। মুসলিম মধ্যবিত্তের জড়তা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয় সামগ্রিকভাবেই কাটতে সময় লেগেছিল। মুসলিম ঘরের মেয়েরাও তাই বাঙালি হিন্দুদের অনুসরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী ছিলেন ফয়জুননেছা। তিনি ১৯২৫ সালে ভর্তি হন। প্রথম মহিলা শিক্ষক করুণাকনা গুপ্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৫ সনে যোগ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু প্রতিক্রিয়াশীলতার মূলেই আঘাত হানেনি, চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। ইংরেজি শিক্ষা এতোদিন মুসলমানরা বর্জন করলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজি শিক্ষা তারা গ্রহণ করতে শুরু করে।

৩. রাজনীতিতে প্রভাব: ত্রিশের দশকে বিপ্লবী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল ছিল পূর্ব বঙ্গের বিপ্লবী কর্মকান্ডের প্রধান কেন্দ্র। বিপ্লবী দল হিসেবে 'অনুশীলন সমিতি' গঠিত হয় ঢাকাকে কেন্দ্র করে পুলিন বিহারী দাসের নেতৃত্বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও পরে শিক্ষক প্রফুল্ল চন্দ্র মুখার্জী ছিলেন 'শ্রী সংঘের' সদস্য। অনিল রায় গঠন করেছিলেন 'দিশারী সংঘ'। তাঁর যোগ্য সহযোগী ছিলেন লীলা নাগ। ইতিহাস বিভাগের কৃতি ছাত্র হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সূর্যসেনের নেতৃত্বে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ নেন ও জেল খাটেন। অনিল রায় ও লীলা নাগসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ সালে আশালতা সেনের নেতৃত্বে ঢাকার মহিলারা আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষিকা করুণাকনাও বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং ১৯৩৮ সনে গ্রেপ্তার হন। পরের বছরই তিনি ইতিহাস বিভাগে যোগ দেন। অবশ্য ব্রিটিশ আমলে বিপ্লবীদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রমান্বয়ে স্বার্থগত কারণে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে দূরে সরে আসতে থাকে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা, মুদ্রা, ডাকটিকেট থেকে বাংলা বাদ দেয়ার ফলে বাঙালি ছাত্ররা প্রতিবাদ জানান। সরকারি উচ্চপদে নিয়োগের শর্ত হিসেবে উর্দুতে পরীক্ষা দেয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে প্রতিবাদ জানায়। এসময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তাদের প্রতিষ্ঠা, রুটি-রোজগার নিয়ে ভাবিয়ে তোলে। তাই এ শ্রেণী প্রথম থেকেই ভাষা সমস্যাকে কেবল সাংস্কৃতিক সমস্যা নয়, বরং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবি আদায়ের সংগ্রাম হিসেবে দেখতে শুরু করে। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ১৯৪০ সালের পর হিন্দু আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জন্য লড়াই করেছে এবং এক পর্যায়ে লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী নিয়ে ফজলুল হক-জিন্নাহ দ্বন্দ্ব হলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে অবাঙালি জিন্নাহকে সমর্থন করেছে, তারাই আবার উর্দুর পৃষ্ঠপোষক জিন্নাহকে

১৯৪৮ সালে ঢাকায় প্রত্যাখ্যান করেছে। এসময়ে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার পর বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়েছে। এভাবে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একটি বিরোধী ধারা সৃষ্টি হয়েছে, তারাই ষাটের দশকে তুলে ধরেছে অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র। এভাবে বাঙালি জনগণ এগিয়ে গেছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে। সেখানেও নেতৃত্ব, আত্মত্যাগের মহিমায় এ বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষক, ১১৫ জন ছাত্র ও ২৮ জন কর্মচারী শহীদ হন।

সারসংক্ষেপ

পূর্ববঙ্গে উচ্চশিক্ষার প্রসার, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ও বিকাশ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পশ্চাৎপদ পূর্ববঙ্গকে কলকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অবস্থান নেয়ার জন্য প্রস্তুত করতে এ বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ধারা সৃষ্টি করে যা ছিল প্রগতিশীল ও সংস্কারমুক্ত। ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে নতুন এই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীই ক্রমে সমাজ ও রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবজাগ্রত বাঙালি জাতীয়তাবাদের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যারা আগ্রহী ভূমিকা পালন করেন তাদের বড় অংশও এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই সৃষ্টি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। রতনলাল চক্রবর্তী, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ ১৯২১-২০০০*, ঢাকা, কল্যাণ প্রকাশন,২০০২।

২। মোহাম্মদ হাননান, *বাঙালির ইতিহাস*, ঢাকা, অনুপম, ১৯৯৮।

৩। আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন, অর্থনৈতিক পটভূমি*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯০।

৪। জাহেদা আহমেদ, "রাষ্ট্র ও শিক্ষা", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, তৃতীয় খন্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০।

৫। Muhammad Abdur Rahim, *The History of the University of Dacca,* Dacca, University of Dacca, 1981.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যের নাম-

(ক) আর. সি. মজুমদার (খ) স্যার এ, এফ. রহমান

(গ) পি. জে. হার্টগ (ঘ) মাহমুদ হোসাইন।

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য ছিলেন-
(ক) পি.জে.হার্টগ (খ) লর্ড হার্ডিং
(গ) স্যার জন টাইমন (ঘ) লর্ড লিটন।

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাশ হয়-
(ক) ১৯৭১ সালে (খ) ১৯৯৯ সালে
(গ) ১৯২০ সালে (ঘ) ১৯২১ সালে।

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু হয় ১৯২১ সালের-
(ক) ১ জুন (খ) ২১ জুন
(গ) ১ জুলাই (ঘ) ২১ জুলাই।

৫। প্রতিষ্ঠালগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ সংখ্যা ছিল-
(ক) ১২ (খ) ১৪
(গ) ১৫ (ঘ) ১৮।

৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ছিলেন-
(ক) লীলা নাগ (খ) করুণাকনা গুপ্তা
(গ) ফজিলাতুন্নেছা (ঘ) পারভীন হাবিব।

৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ছাত্রী-
(ক) পারভীন হাবিব (খ) ফয়জুননেছা
(গ) জেরিন তালিব (ঘ) হাসিনা হোসেন।

৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী শিক্ষক ছিলেন-
(ক) লীলা নাগ (খ) ফয়জুন্নেছা
(গ) করুণাকনা গুপ্তা (ঘ) জেরিন তালিব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশের বর্ণনা দিন।

২। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণ কি ছিল লিখুন। পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

২। বিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ বর্ণনা করুন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা আলোচনা করুন।

পাঠ-৫

লাহোর প্রস্ত াব (১৯৪০)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয় ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন;*
- *এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *লাহোর প্রস্তাবের অসঙ্গতি ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতে পারবেন;*
- *লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব কিনা তা মূল্যায়ন করতে পারবেন।*

ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যা 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। মুসলিম লীগ প্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে তদানীন্তন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক এ প্রস্তাবটি পেশ করেন। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন "... ... আমি প্রথমে মুসলমান এবং পরে বাঙালি। ১৯০৬ সালে বাংলাদেশেই প্রথম মুসলিম লীগের নিশান উত্তোলিত হয়েছিল। এখন বাংলাদেশের নেতা হিসেবে সেই মুসলিম লীগের মঞ্চ হতে আমি মুসলমানদের জন্য আবাসভূমি স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করার অধিকার পেয়েছি।" এই প্রস্তাবকে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য মুসলিম লীগের প্রথম গঠনমূলক প্রস্তাব বলা যায়। যদিও পরবর্তীকালে এ প্রস্তাব বিকৃত করে পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে রূপ দেয়া হয়, যার অনিবার্য পরিণতিতে ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়।

লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

লাহোর প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং এ স্বায়ত্তশাসনের দাবি অনেক দিনের পুরনো। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ও পরে মুসলমানরা স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি করে আসছিল। লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬), জিন্নাহর চৌদ্দ দফা দাবিতেও (১৯২৯) এর প্রতিফলন ছিল । তবে কংগ্রেস সব সময় এ দাবিকে সহজে মেনে নেয়নি। যে কারণে ভারতীয় রাজনীতিতে এ দাবি ক্রমান্বয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে। এছাড়া যেসব কারণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি সম্বলিত লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহলো:

ক. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কার্যকারিতা: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতীয় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। এজন্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ- উভয় দলই এর বিরোধিতা করায় ঐ আইন পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে পারেনি। এ আইন শুধু প্রদেশগুলোতে কার্যকর করা

হয় এবং ১৯৩৭ সালে প্রদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুসলিম লীগ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করলেও আইনসভায় এককভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে বাধ্য হয়ে লীগ, কংগ্রেসের সাথে যুক্তভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব দিলে কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। শুধু বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু মুসলিম লীগের সাথে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনা ছাড়াই কংগ্রেস মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মন্ত্রিসভা গঠন করে। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের পর আইন-আদালতে কংগ্রেস দলীয় পতাকা উত্তোলন ও বন্দে মাতরম গাওয়ার ব্যবস্থা করে। কংগ্রেস শাসনামলে বিভিন্ন প্রদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলে মুসলমানদের অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়ে। এমনকি মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে পর্যন্ত বাধা দেয়ার মত ঘটনা ঘটে। কংগ্রেসের এমন ধারার শাসনব্যবস্থা এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থান সুখকর নয়।

খ. নেহেরু রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া: ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিধানের অগ্রগতির ইতিহাসে নেহেরু রিপোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান দলিল। সকল রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে ব্রিটিশ ভারতের এ সাংবিধানিক সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ১৯২৮ সালে নেহেরু কমিটি গঠিত হয়। কমিটি লক্ষ্মৌ চুক্তিতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি অস্বীকার করে সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। নেহেরু রিপোর্টের সুপারিশমালা বিবেচনার জন্য কলকাতায় সর্বদলীয় অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এ অধিবেশনে মুসলিম লীগ ও খেলাফত কমিটির দাবি বিবেচনার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু নেহেরু রিপোর্টের ওপর মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মুসলিম লীগের সংশোধনী প্রস্তাব সাব-কমিটি কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়। ফলে ভারতীয় মুসলিম নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার পরিবর্তন সূচিত হয়।তারা বুঝতে পারেন যে, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করাও সম্ভব নয়।

গ. গোল টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা: ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের মধ্যে চরম উত্তেজনা প্রশমন এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের লক্ষে বিলেতে (লন্ডনে) ব্রিটিশ সরকার, ভারতীয় বিভিন্ন দল, সম্প্রদায় ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একগুয়েমির কারণে সম্প্রদায়গত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইনসভার প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। এতে কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমানদের ন্যূনতম দাবি মেনে না নেয়ার কারণে কংগ্রেস সম্পর্কে মুসলিম লীগের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। পাশাপাশি মুসলিম লীগ পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবিত হয়।

ঘ. হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের প্রভাব: উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে, যখন কংগ্রেস সভাপতি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু মন্তব্য করেন যে, ভারতে দু'টি শক্তির অস্তিত্ব লক্ষণীয় একটি সরকার, অপরটি কংগ্রেস দল । অন্য কোন দলের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতে নারাজ। তাঁর এ মন্তব্য মুসলমান নেতাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জিন্নাহ এতদিন পর্যন্ত রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রবক্তা ছিলেন, তিনিও এতে ব্যথিত হন। বস্তুত ভারতীয় জনগণের ঐ অংশটি মনে করত যে, ব্রিটিশরা চলে গেলে হিন্দু সম্প্রদায় ভারত শাসন করবে। তারা মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখত। তাই মুসলমানদের আলাদা একটি অংশ প্রতিষ্ঠিত করার পরোক্ষ ইচ্ছা তাদেরও ছিল। এ সম্পর্কে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা সরদার প্যাটেল-এর মন্তব্য সম্পর্কে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর India Wins Freedom গ্রন্থে লিখেছেন, 'I was surprised and pained when Patel in reply said that whether we liked it or not there were two nations in India.'

ঙ. মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রাগ্রসর চিন্তাধারা: লাহোর প্রস্তাবে যে স্বাধীন মুসলিম আবাসভূমির দাবি করা হয়েছে, অনুরূপ একটি প্রস্তাব ১৯৩০ সালে মহাকবি আল্লামা ইকবাল তাঁর একটি ভাষণে উল্লেখ করেন। তিন বছর পর ১৯৩৩ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলোর জন্য 'পাকিস্তান' নামের উদ্ভাবন করেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলমানদের জন্য পৃথক কোন রাষ্ট্রের কথা ভাবেন নি। কিন্তু পরে কংগ্রেস সভাপতি নেহেরুর দম্ভোক্তি তাঁকে আহত করে।

চ. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ও মুসলিম স্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তাতে কংগ্রেস অধিকাংশ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। মুসলিম লীগ বাংলা ও পাঞ্জাবে উল্লেখযোগ্য আসন লাভ করে এবং সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করে। মাদ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ, বোম্বাই ও আসামে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই এককভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করে। এছাড়া ক্ষমতা গ্রহণ করে কংগ্রেস অফিস আদালতে কংগ্রেস দলীয় পতাকা উত্তোলন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'বন্দে মাতরম' জাতীয় সংঙ্গীত, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দি চালু করে। এসময় স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ভারতে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ফলে দাঙ্গা দেখা দেয় যা সাম্প্রদায়িক সংকটের সৃষ্টি করে।

জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতি তত্ত্ব ঘোষণা

১৯৪০ সালের ২২ মার্চ নিখিল ভারতে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জিন্নাহ ঘোষণা করেন, "The Mussalmans are not a minority... Mussalmans are a nation according to any definition of a nation... ." তিনি ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির দাবি তোলেন। এটিই জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' (Two Nations Theory)। জিন্নাহ্‌র 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর রচিত ছিল না। তা ছিল প্রধানত অখন্ড ভারতে অনিবার্য হিন্দু আধিপত্যের স্থলে ভারত বিভক্তি এবং আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ থেকে স্থায়ী পরিত্রাণের লক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ, কৃষ্টি, ভাষা, অঞ্চল ও ঐতিহ্যে বিভক্ত ভারতীয় মুসলমানদের একই পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করার একটি কৌশল। প্রকৃতপক্ষে অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিপত্যের ভীতি মুসলমান সম্প্রদায়কে শংকিত করে তোলে। এ অবস্থায় জিন্নাহ্ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের বিভক্তি ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করলে তা ভারতীয় মুসলমানদের চেতনামূলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেয়। পৃথক আবাসভূমি বা স্বাধীনতার স্বপ্ন তাদেরকে জাগিয়ে তোলে। ফলে পাকিস্তান আন্দোলন প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয় ও বৈশিষ্ট্য

লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়:

"নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকর হবে না বা তা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যদি তা নিম্নলিখিত মূল নীতিভিত্তিক না হয়। যথা- প্রয়োজনবোধে সীমানার পুনর্বিন্যাস সাধন করে এবং ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর নিকটবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর সমন্বয় সাধন করে যেমন- ভারতের উত্তর-

পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের এলাকাগুলোকে একত্রিত করে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে এবং এদের অঙ্গরাজ্যগুলোও স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে।"

এ প্রস্তাবে আরো উল্লেখ করা হয়, এসব অঙ্গরাজ্যে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শাসন সংক্রান্ত অধিকার রক্ষা করার জন্য ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হবে। যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে মুসলমানদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের পরামর্শক্রমেই সংবিধানে পর্যাপ্ত রক্ষাকবচ রাখতে হবে। প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বিষয় পাওয়া যায়-

১. ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে প্রয়োজনীয় রদবদলের মাধ্যমে পৃথক অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে।

২. এ সকল অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. এ সমস্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে স্বায়ত্তশাসিত।

৪. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাদের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫. দেশের যে কোন ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

গ. লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ও তাৎপর্য

কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া: কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রস্তাবের সমালোচনা করে মহাত্মা গান্ধী বলেন, "যদি আমরা শ্রী জিন্নাহ্‌র অভিমত গ্রহণ করি, তা হলে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের মুসলমানরা দু'টি স্বতন্ত্র ও পৃথক জাতি হয়ে পড়ে।" মহাত্মা গান্ধী ভারত বিভাগকে 'পাপ কাজ' বলে মন্তব্য করেন। কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি গঠনকে 'অবান্তর' বলে মন্তব্য করেন। কলকাতার হিন্দু পত্রিকাগুলো লাহোর প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে এবং একে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে আখ্যায়িত করে।

বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া: লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও বাংলাদেশের পৃথক রাষ্ট্র সত্তার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় এ.কে. ফজলুল হক মনে করেন, বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা বাঙালি মুসলমানদের হাতে আসবে এবং এ ক্ষমতা তারা নিজেরা ভোগ করবে, কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের হাতে তুলে দিবে না। সোহরাওয়ার্দী মনে করেন, এর ফলে প্রত্যেক প্রদেশ এর উপযোগী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে। তিনি আরো বলেন, মুসলিম লীগের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলমানরা তাদের প্রদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে তারা এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে। বাংলাদেশের মুসলিম লীগের নেতাদের এমনি আশা আকাংখা সত্ত্বেও লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিজাতি তত্ত্ব যুক্ত করায় এবং একে পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করায় এর প্রস্তাবক ফজলুল হক এর সমর্থন করেন নি। কারণ লাহোর প্রস্তাবে 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' বা 'পাকিস্তান ' শব্দের উল্লেখ ছিল না। যদিও শেষপর্যন্ত অবাঙালি নেতৃবৃন্দের তৎপরতায় দ্রুত লাহোর প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।এর ফলে মুসলিম

লীগের অবাঙালি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বাঙালি নেতৃবৃন্দের দ্বন্দ্ব প্রকটরূপ নেয়। যদিও ভারত উপমহাদেশে কংগ্রেসের একাধিপত্যের অবসানের লক্ষে মুসলমানরা লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন দেয়। বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমান ও ছাত্র সমাজের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া: ব্রিটিশ সরকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় ভারতের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভে আগ্রহী ছিল। ১৯৪০ সালে পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা মারাত্মক রূপ লাভ করলে ব্রিটিশ সরকার লাহোর প্রস্তাবকে গুরুত্বসহ বিবেচনা করে। এর ফলে ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে যে, ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় তথা মুসলিম লীগের সম্মতি ছাড়া ভারতবর্ষে শাসনতান্ত্রিক কোন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। লাহোর প্রস্তাবের বিরোধিতাকারী কংগ্রেস ধীরে ধীরে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং পাকিস্তান দাবি মেনে নেয়। পরিশেষে ব্রিটিশ সরকারও চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, লীগের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত বিভাগ করা না হলে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের বিকল্প পথ নেই। তাই ব্রিটিশ সরকার অখন্ড ভারতবর্ষের পরিবর্তে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পথ বেছে নেয়। এর ফলে ভারত উপমহাদেশ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ঘ. লাহোর প্রস্তাবের অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা

প্রথমত, লাহোর প্রস্তাবের ধারাগুলি বিশ্লেষণ করলে কিছুটা অস্পষ্টতা ও স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়। যেমন- এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র কথাটিকে বহুবচনে Independent States ব্যবহার করায় বাক্যাংশটি দু'টি মুসলিম রাষ্ট্র- একটি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে এবং অপরটি পূর্বাংশে বুঝায়। এ থেকে বোঝা যায়, লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা চাওয়া হয়েছিল। এই প্রস্তাবে অখন্ড রাষ্ট্রের (পাকিস্তান) কথা উল্লেখ নেই; বরং দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়- একটি উত্তর-পশ্চিম ভারতে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর নিয়ে, অপরটি উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলাদেশ ও আসামের সমন্বয়ে। এ দু'টি রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশগুলি স্বায়ত্তশাসিত হবে। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী ও ক্ষমতালিপ্সু গোষ্ঠী এই সত্য কথাটির অবমানা করে ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত Muslim League Legislators Convention-এ অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে।খোদ জিন্নাহ্ রাষ্ট্রের এই বহুত্ববোধক (States) শব্দটিকে অসাবধানতাপ্রসূত ও ছাপার ভুল বলে উল্লেখ করেন এবং একটি অখন্ড রাষ্ট্রের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী অঙ্গরাজ্য স্বায়ত্তশাসিত হতে পারে। কিন্তু সার্বভৌম হতে পারে না। অঙ্গরাজ্য সার্বভৌমত্বের অধিকারী হলে এটা আর অঙ্গরাজ্য থাকে না- একটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অথচ লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছে- স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলি স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। এই স্ববিরোধী ভাষা হতে বলা যায় যে, লাহোর প্রস্তাবের প্রণেতাগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্র সমবায় (confederation) গঠনের সুপারিশ করেছেন।অথবা আবুল হাশিমের মতানুসারে বলা যায় যে, লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম ফেডারেল এবং এদের অঙ্গরাজ্যগুলি হবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত।

ঙ. লাহোর প্রস্তাব কি পাকিস্তান প্রস্তাব?

মূল লাহোর প্রস্তাবে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি নিয়ে একাধিক 'স্বাধীন রাষ্ট্র' গঠনের কথা বলা হয়েছিল। এ প্রস্তাবের কোথাও একটি মুসলিম রাষ্ট্রের কিংবা 'পাকিস্তান' শব্দের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রহণের পরদিন কংগ্রেস প্রভাবাধীন পত্র-পত্রিকাগুলি 'পাকিস্তান প্রস্তাব' শিরোনামে লীগের প্রস্তাবের দাবি-দাওয়া প্রকাশ করে।গ্রেট ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকাগুলিতেও পরবর্তী সময়ে 'লাহোর প্রস্তাব'কে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে অভিহিত করা হয়। এতে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। কংগ্রেস সমর্থিত পত্র-পত্রিকাগুলো মূলত সমালোচনাসূচক অর্থেই 'লাহোর প্রস্তাব'কে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে অভিহিত করেছিল। কারণ, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অখন্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ বলেন যে, পাকিস্তান শব্দটি তাঁর বা মুসলিম লীগের উদ্ভাবিত নয়। তিনি বলেন যে, সকলেই জানে পাকিস্তান শব্দটি কিছু হিন্দু ও ব্রিটিশ পত্রিকা কর্তৃক তাদের ওপর আরোপ করা হয়েছে, তবে তা পাকিস্তান নামেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে বেশি। জিন্নাহ্ আরো বলেন যে, কতদিনই বা এত বড় শব্দ ব্যবহার করা যায়। এ জন্য মাত্র একটি শব্দে (পাকিস্তান) প্রস্তাবটিকে অভিহিত করার জন্য তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তার অর্থ, জিন্নাহ্র কথায় এটাই বুঝায় যে, প্রস্তাবটি প্রথমে লাহোর প্রস্তাব নামে অভিহিত হলেও তাঁর মনে আসলে অখন্ড পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল। আর তাই তিনি পত্র-পত্রিকার দোহাই দিয়ে পাকিস্তান প্রস্তাব কথাটিকে সমর্থন করেছেন। এ সময় থেকে পাকিস্তান নামটি জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হয়। কিন্তু তখন পাকিস্তান বলতে এক রাষ্ট্র বুঝায় নি; লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী একাধিক রাষ্ট্র বুঝাত।

১৯৪৩ সাল পর্যন্ত জিন্নাহ্ লাহোর প্রস্তাব বলতে একাধিক রাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি পাকিস্তান নাম এক রাষ্ট্রের অর্থে ব্যবহার করেন। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্নাহ্ ও গান্ধীর মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়, তাতে জিন্নাহ্ প্রথম প্রকাশ করেন যে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হবে। দুই অঞ্চলের প্রদেশগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে কি না জিন্নাহ্র কাছে গান্ধী সে বিষয়ে জানতে চান। উত্তরে গান্ধীকে তিনি জানান যে, প্রদেশগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে না, এগুলি পাকিস্তানের ইউনিট হবে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক রদ-বদল করে এদের সমবায়ে পাকিস্তান গঠিত হবে। জিন্নাহ্ ১৯৪৫ সালের ৮ নভেম্বর এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার প্রতিনিধিকে বলেন যে, পাকিস্তান একটি যুক্তরাষ্ট্র হবে এবং এর প্রদেশগুলি স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হবে। আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মত পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র হবে এবং মুদ্রা, জাতীয় প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হবে।

১৯৪৬ সালে মূল লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে 'স্টেটস' শব্দের পরিবর্তে 'স্টেট' শব্দ ব্যবহার করার পর থেকে লাহোর প্রস্তাব নামেই অভিহিত হতে থাকে। লাহোর প্রস্তাব এক রাষ্ট্রের অর্থে ব্যবহার করে জিন্নাহ্ এতে মূলগত পরিবর্তন প্রচলন করেন। এই পরিবর্তনের পেছনে দলীয় কোন নিয়মতান্ত্রিক সমর্থন যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না নৈতিক ভিত্তিও। তবুও এই প্রস্তাবকে সামনে রেখেই ভারতের মুসলমান জনগণ মুসলিম জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত হয়। এরই ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে 'পাকিস্তান' নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

সারসংক্ষেপ

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ও মুসলমানদের একটি পৃথক আবাসভূমি দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ছিল। যদিও মুসলিম লীগের অবাঙালি নেতৃবৃন্দ পরবর্তীকালে একাধিক রাষ্ট্রের স্থলে একটি রাষ্ট্রের পক্ষে তৎপরতা চালান। এতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। যদিও লাহোর প্রস্তাবের কোথাও পাকিস্তান শব্দটির উল্লেখ ছিল না।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০২।

২। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, ১ম খন্ড*, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪।

৩। সিরাজুদ্দীন হোসেন, *ইতিহাস কথা কও*, ঢাকা, নওরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৪।

৪। শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়, *জিন্নাহ পাকিস্তান নতুন ভাবনা*, কলকাতা, মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৮৮।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাকিস্তান নামটি উদ্ভাবন করেন-
(ক) কবি ইকবাল (খ) চৌধুরী রহমত আলী
(গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ (ঘ) এ.কে. ফজলুল হক

২। দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভাবক-
(ক) এ.কে. ফজলুল হক (খ) মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
(গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ (ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৩। লাহোর প্রস্তাব সংশোধিত হয়-
(ক) ১৯৪২ সালে (খ) ১৯৪৩ সালে
(গ) ১৯৪৪ সালে (ঘ) ১৯৪৬ সালে

৪। ভারত বিভাগকে পাপ কাজ বলে কে ঘোষণা করেন?
(ক) মহাত্মা গান্ধী (খ) জওহরলাল নেহেরু
(গ) বল্লভ ভাই প্যাটেল (ঘ) মাওলানা আজাদ

৫। দ্বিজাতি তত্ত্ব ঘোষিত হয় ১৯৪০ সালের-
(ক) ২০ মার্চ (খ) ২১ মার্চ
(গ) ২২ মার্চ (ঘ) ২৩ মার্চ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। লাহোর প্রস্তাবের ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

২। লাহোর প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে লিখুন।

৩। লাহোর প্রস্তাবকে কি পাকিস্তান প্রস্তাব বলা যায়? আপনার অভিমত সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি আলোচনা করুন।

২। লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করুন। লাহোর প্রস্তাব কি পাকিস্তান প্রস্তাব ছিল?

পাঠ-৬

১৯৪৭ সালের যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠা প্রস্ত াব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *যুক্ত বাংলা প্রস্তাবের কারণ জানতে পারবেন;*
- *যুক্ত বাংলা প্রস্তাবের প্রাক্কালে বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা জানতে পারবেন;*
- *বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তির বর্ণনা দিতে পারবেন;*
- *এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করতে পারবেন।*

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভক্তিকরণ যখন প্রায় চূড়ান্ত, এমনি এক ঐতিহাসিক সময়ে বাংলার চিফ মিনিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে "স্বাধীন, সার্বভৌম, অখন্ড বাংলা" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এর ভিত্তিতে মে মাসে বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঐকমত্যে উপনীত হয়ে যে চুক্তি স্বাক্ষর করেন তা 'বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এই উদ্যোগের সাথে আরো সংশ্লিষ্ট ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী আবুল হাশিম, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংসদীয় নেতা কিরণ শংকর রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। যদিও এ উদার, অসাম্প্রদায়িক প্রস্তাব তৎকালীন কংগ্রেস, মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও ব্রিটিশ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। এ প্রচেষ্টা সফল হলে ১৯৪৭ সালেই ভারত-পাকিস্তানের পাশাপাশি অখন্ড বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতো। ভিন্নভাবে লেখা হতো বাঙ্গালির ইতিহাস।

ক. যুক্ত বাংলা প্রস্তাবের কারণ

স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে ওঠার পিছনে কি কারণ ছিল এ সম্পর্কে পন্ডিত ও গবেষকরা বিভিন্ন মতামত দিয়ে থাকেন-

বাংলা বিভক্তি প্রতিরোধ: অধিকাংশ পন্ডিত মনে করেন যে, এটি ছিল বাংলা বিভক্তি রোধের উদ্দেশে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর একটি বিকল্প প্রস্তাব । কংগ্রেস, মহাসভা সহ অবাঙালি হিন্দু নেতাদের বড় অংশই বাংলা বিভক্তির পক্ষে ছিলেন। এই হিন্দু নেতারাই হিন্দু সম্প্রদায়কে নিয়ে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়েছিলেন। তারাই আবার ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগ দাবি করেন। যে মুসলমান নেতারা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হওয়ায় খুশি হয়েছিলেন তাঁরাই ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। মূলত ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার ফলে অন্তবর্তী সরকারে কংগ্রেস ও লীগ

সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধের দরুণ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন কংগ্রেস নেতা নেহেরু ও প্যাটেল ভারত ও বাংলা এবং পাঞ্জাব বিভক্তির দাবি উত্থাপন করেন। অথচ বাংলার মুসলমান নেতারা বাংলার অখন্ডতার পক্ষপাতী ছিলেন। এসময় বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের প্রথম থেকে কংগ্রেস ও মহাসভার বাংলা বিভক্তির প্রচেষ্টা চাঙ্গা হলে বাংলার মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম এই প্রদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রস্ড়াব করেন। এদের প্রস্তাব ছিল, 'বাংলাদেশ' পাকিস্তান বা হিন্দুস্তান কোন রাষ্ট্রেই যোগ দেবে না। এটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। প্রথমে বাংলার অধিকাংশ মুসলমান নেতাই এ প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী বলেন, 'বাংলাদেশ বাঙালিদের এবং এটি অবিভাজ্য।'

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়াস: বাঙালি হিন্দুরা ভারতীয় জাতীয়তা ও অখন্ড ভারতের আদর্শে বিশ্বাসী থাকলেও তারা বাংলার জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের ইস্যুতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে ফাটল ধরলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বার্থে আবার তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ফিরে আসে। বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতারা সম্মিলিতভাবে বাঙালির জাতীয়তা মজবুত করার চেষ্টা চালান। ১৯২৩ সালে স্বরাজ পার্টির নেতা সি. আর. দাস বাঙালি মুসলমান নেতা এ.কে. ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রশ্নে বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষর করেন। এসময় থেকে বাঙালি ঐতিহ্য, সাংস্কৃতি, বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয় সত্তার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। যদিও ১৯৩৭ সালে বাংলা প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্র করে দু'সম্প্রদায়ের মতানৈক্য আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৪০-এর দশকে এই সম্পর্কের সংকট সমাধান হতে থাকে। মূলত শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় বাংলার স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসন ইস্যুতে মতদ্বৈততা কমতে থাকে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্ড়াবের পর মুসলমানরা ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ এবং হিন্দুরা পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের দাবি উত্থাপন করে। অবশ্য মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের স্বার্থপরতার কারণে বাংলার মুসলমানরা বাংলাকে স্বাধীন ও সার্বভৌম করার বিষয় চিন্তা করেন। বাঙালি হিন্দু নেতাদের কেউ কেউ এ বিষয় সহমত পোষণ করেন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বাংলা বিভাগের প্রচেষ্টার বিপরীতে তারা যুক্ত বাংলা দাবিতে কিছু উদ্যোগ নেন। কংগ্রেসের বাঙালি নেতৃবৃন্দের মধ্যে শরৎ বসু, কিরণ শংকর রায় এবং মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম ছিলেন এই সম্প্রীতির উদ্যোক্তা।

ঐতিহাসিক কারণ: ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলার একটি স্বতন্ত্র সত্তা সুদীর্ঘকাল থেকে লক্ষণীয়। অষ্টম শতকে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে প্রায় ৫০০ বছর ধরে বাংলা ছিল নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক স্বাধীন ভূখন্ড। বাংলার স্বাধীন সুলতান ও শাসকদের আমলে বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ভৌগোলিক ঐক্য এবং ভাষা ও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের জাতীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য অবস্থান গড়ে ওঠে। মুঘল ও ব্রিটিশদের সময় বাঙালি জাতীয়তার অগ্রগতি নানা কারণে ব্যাহত হয় এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্রমশ দুরত্ব বেড়ে যায়। যদিও ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন সময় আবার ঐক্যের প্রয়াস নেয়া হয়। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের প্রাক্কালে বাংলাকে বাইরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহীত হয়।

বাঙালি মুসলমান বনাম অবাঙালি মুসলমান দ্বন্দ্ব: ১৯৪০ সালের পর অবাঙালি মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ও বাঙালি মুসলমান নেতৃত্বের মধ্যে ভিন্ন জাতিসত্তার দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। ফজলুল হকের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতাদের দ্বন্দ্বের কারণ ছিল অবাঙালি নেতাদের বাংলার মুসলমানদের সমস্যার প্রতি অবহেলা। বহু বিষয় ও ঘটনা ফজলুল হক, আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দী মতো নেতাদের মনে এ ধারণার জন্ম দিয়েছে জিন্নাহর প্রস্তাবিত পাকিস্তান বাংলার জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। ফজলুল হক প্রথম থেকেই দ্বিজাতিতত্ত্ব

ও লাহোর প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে গণ্য করার বিপক্ষে ছিলেন। যদিও পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে তাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কিন্তু বাংলার ব্যাপারে তাঁদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

খ. যুক্ত বাংলা প্রস্তাবের প্রাক্কালে ভারত ও বাংলার রাজনীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, দু'দিন পূর্বে অথবা পরে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে হবেই। তাছাড়া ভারতবর্ষে তখন স্বাধীন লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠায় আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলির বিখ্যাত ফ্রেব্রুয়ারি ঘোষণার (১৯৪৭) পর এটি একরকম নিশ্চিত হয়ে যায়। তিনি তাঁর ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, ব্রিটেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে শাসনব্যবস্থা গুটিয়ে নিতে চায়। এ সময়ের মধ্যে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমঝোতা না হলে প্রাদেশিক সরকারে হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হতে পারে এমন আভাস ছিল। বলা যায়, এর মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির ইঙ্গিত প্রচ্ছন্নভাবেই ফুটে ওঠে। সুযোগ পেয়ে কাল বিলম্ব না করে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে কট্টরপন্থী 'হিন্দু মহাসভা' কলকাতাকে কেন্দ্র করে অবিভক্ত বাংলার হিন্দু প্রধান অঞ্চলসমুহ নিয়ে পশ্চিম বাংলা প্রদেশ গঠনের দাবী তোলে এবং তা ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করণের আন্দোলন শুরু করে।এটলির ফেব্রুয়ারি ঘোষণার তিন সপ্তাহের মধ্যে অখন্ড ভারত ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এতদিনকার প্রবক্তা কংগ্রেস পার্টির ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্তকরণের সুপারিশ সম্বলিত প্রস্তাব গ্রহণ করে।বাংলা বিভক্তি আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতাস্থ বাঙালি অবাঙালি শিল্প ও বণিক সমিতিসমূহ স্বত:স্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে।পাশাপাশি প্রভাবশালী হিন্দুত্ববাদী পত্র-পত্রিকাসমূহ যেমন- অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি বাংলা বিভক্তি প্রশ্নে ব্যাপকভাবে হিন্দু জনমত গড়ে তুলতে সহায়তা করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ওপরে উল্লেখিত সবগুলো উৎস ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে তা এক ভিন্ন মাত্রায় উত্থিত হয়।

রাজনীতির এমন পরিস্থিতিতে সোহরাওয়ার্দীর সাথে আবুল হাশিম, 'স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসেন। সোহরাওয়ার্দী আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রস্তাব দেয়ার আগে বিভিন্ন বক্তৃতায় বাংলা বিভক্তির পশ্চাতে সক্রিয় হিন্দু মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী, এ দাবির অসারতা, বাংলা বিভক্তির পরিণতি, বাংলার ঐক্যবদ্ধ অপরিহার্যতা, স্বাধীন অখন্ড রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও এর ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিলের এক বক্তৃতা অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি এতে বলেন যে, "বাংলা দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য মহলবিশেষ থেকে আন্দোনের সূত্রপাত হয়েছে। এর একমাত্র কারণ যে, হিন্দুদের একটি শ্রেণী মনে করে বঙ্গীয় মন্ত্রিসভায় তাদের যথোপযুক্ত অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।" বাংলা বিভাগের দাবিটি তাদের একাংশের তীব্র হতাশা থেকে উদ্ভূত বলে উল্লেখ করে সোহরাওয়ার্দী বলেন, "এমন কি হিন্দু স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গ বিভাগ আত্মহত্যার সামিল। স্বাধীন বাংলা হবে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে ধর্নাঢ্য ও সমৃদ্ধশালী দেশ - সেখানে জনগণ উন্নত জীবন যাত্রার মাঝে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এবং একটি মহান জাতি হিসেবে উন্নতির সোপানে উপনীত হতে সক্ষম হবে। সত্যিকার অর্থে প্রাচুর্য ভরা একটি দেশ হবে এই বাংলা এবং বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে যাবার পর বাঙালি জাতিই হবে বাংলার ভবিষ্যতের নিয়ন্তা।" সোহরাওয়ার্দী আরো বলেন, "অখন্ড বাংলা কৃষি, শিল্প ও

বাণিজ্যে হবে সমৃদ্ধশালী এবং কালের আবর্তে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ও প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে সেই দেশ। বাংলা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে, তবে তা স্বপ্ন বা কল্পনা হবে না।"

সোহরাওয়ার্দী এক পর্যায়ে বলেন, "আমি বরাবরই বাংলার ভবিষ্যৎ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করে আসছি, কোনরূপ ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের অংশ হিসেবে নয়। অনুরূপ কোন রাষ্ট্র একবার সংস্থাপিত হলে, তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার ওপর। ... বাংলা যদি মহান হতে চায় তবে সে শুধু তার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই তা হতে পারবে। তাকেই নিজের সম্পদের অধিকারী ও নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে হবে। বাংলার ওপর অন্যের শোষণের উচ্ছেদ করতে হবে। ভারতের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বাংলাকে বলি দেয়া যাবে না। কাজেই হিন্দু সমাজের যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক হয়তো হালকাভাবে বাংলাকে ভাগ করার কথা বলেন তাদের কাছে আমার আবেদন, অশেষ ক্ষতি ও দুর্ভোগের ধাত্রী এই আন্দোলন প্রত্যাহার করুন। আমরা সকলে একাত্ম হয়ে উদ্যোগী হলে নিশ্চয়ই এমন একটি ভবিষ্যৎ শাসন প্রকল্প উদ্ভাবন করতে পারব।"

সোহরাওয়ার্দীর যোগ্য সহযোগী আবুল হাশিম পর ২৯ এপ্রিল এক বিবৃতিতে এ পরিকল্পনার স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরে বাংলা বিভক্তির আন্দোলনে মদদ দানের জন্য বিদেশী পুঁজি এবং ভারতীয় দোসরদের দায়ী করেন। তিনি হিন্দুদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, তারা বাংলার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন এক সম্প্রদায়ের পক্ষে অপরকে পদানত করে রাখা সম্ভব নয়। তিনি মন্তব্য করেন যে, "উদ্ভূত সংকট নিরসনের পন্থা হচ্ছে গভীর দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন করা , একে বিভক্ত করা নয়।"

গ. বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তির ধারা

শরৎচন্দ্র বসুর কলকাতাস্থ ১নং উডবার্ন পার্কের বাসভবনে ১৯৪৭ সালের ২০ মে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সেখানে মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ আলী, আবুল হাশিম এবং এ. এম. মালিক, অন্যদিকে হিন্দু নেতাদের মধ্যে শরৎ বসু, কিরণ শংকর রায় ও সত্যরঞ্জন বখশী উপস্থিত ছিলেন। তবে লীগের নাজিমুদ্দিন গ্রুপের সদস্যরা, যেমন নুরুল আমিন, ইউসুফ আলী চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন না। সভায় আলোচনান্তে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মুসলিম লীগের পক্ষে আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের পক্ষে শরৎ বসু প্রস্তাবিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তির মূল বিষয় ছিল নিম্নরূপ:

১. বাংলা হবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে এ রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি হবে, তা সে নিজেই নির্ধারণ করবে।

২. হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে আসন সংখ্যা বন্টন করে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভা নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। হিন্দু ও তফসিলী হিন্দুদের মধ্যে জনসংখ্যা অনুপাতে অথবা উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আসন বন্টন করা হবে। নির্বাচন হবে একটি এলাকা থেকে একাধিক প্রার্থী নির্বাচনমূলক (Multiple) এবং ভোট হবে বন্টনধর্মী (Distributive) সর্বোচ্চ আসন সংখ্যাভিত্তিক (Cumulative) নয়। কোন প্রার্থী যদি নির্বাচিত তার নিজ সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করেন এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ভোটের ২৫% পান, তা হলে তিনি নির্বাচিত

বলে গণ্য হবেন। যদি কোন প্রার্থী এ শর্ত পূরণে ব্যর্থ হন, তা হলে যিনি নিজ সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ ভোট লাভ করবেন তাকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

৩. স্বাধীন বাংলার এরূপ পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকার মেনে নিলে কিংবা ঘোষণা দিলে বাংলা বিভক্ত হবে না, এরূপ ঘোষণা দিলে বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং চিফ মিনিস্টার পদ বাদে সমসংখ্যক মুসলমান ও হিন্দু (তফশিলী হিন্দুসহ) সদস্য নিয়ে একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। এ মন্ত্রিসভায় চিফ মিনিস্টার হবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন একজন হিন্দু।

৪. নতুন সংবিধান অনুযায়ী আইনসভা ও মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়া পর্যন্ত হিন্দু (তফসিলী সম্প্রদায়সহ) এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সামরিক বাহিনী ও পুলিশসহ সকল চাকরিতে সমান অংশ থাকবে। এসব চাকরিতে কেবল বাঙালিদেরই নিয়োগ করা হবে।

৫. ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে বঙ্গীয় আইনসভায় ৩০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। এর মধ্যে মুসলমান ও অমুসলমান সদস্য সংখ্যা হবে যথাক্রমে ১৬ জন মুসলমান এবং ১৪ জন হিন্দু।

উপর্যুক্ত প্রস্তাবগুলো শরৎ বসু নিজেই মুসাবিদা করেন, নাকি সোহরাওয়ার্দীও সাথে ছিলেন- সে কুয়াশা গবেষকরা এখানো ভেদ করতে পারেন নি। পরে প্রায় সবগুলো পত্র-পত্রিকায়ই এই প্রস্তাবগুলো প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের অনেকেই সন্দেহ করেন যে, প্রস্তাবগুলো রচনার পূর্বে শরৎ বসুর সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে। প্রস্তাব গুলো প্রকাশিত হবার পর দৈনিক আজাদ মন্তব্য করেছিল যে, শরৎ বসু যেহেতু অখন্ড বাংলা চান না সেহেতু আন্দোলন থেকে সরে যাবার জন্যই প্রস্তাবগুলো করেছেন- যাতে করে মুসলিম লীগ ওগুলো না মানে। শোনা যায় শরৎ বসু বৈঠকে প্রস্তাবগুলো সামনে এনে বলেছিলেন, এভাবেই লীগ যদি এগুলো মেনে নেয় তবেই তিনি অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।

বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া

মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া: মুসলিম লীগের মধ্যে অখন্ড বাংলা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের পরিকল্পনা অবাঙালি নেতৃবৃন্দ এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আকরাম খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দিন, নুরুল আমীন নেতিবাচকভাবে দেখেন। যদিও ৩০ এপ্রিল মাওলানা আকরাম খাঁর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভায় স্পিকার নুরুল আমীনকে আহ্বায়ক করে এ ব্যাপারে একটি কমিটি গঠিত হয়। প্রথম দিকে এসব নেতারা স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার পক্ষে থাকলেও ৫মে আকরাম খাঁ বলেন, পাকিস্তানের অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নই ওঠে না। খাজা নাজিমুদ্দিন বৃহত্তর অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ছিলেন। খাজা নাজিমুদ্দিন ক্রমান্বয়ে এ চুক্তির প্রকাশ্য সমালোচনা শুরু করেন। তিনি চুক্তিকে ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ বলে অভিহিত করেন। ২৮ মে চূড়ান্তভাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ একটি ঘোষণায় উল্লেখ করে যে সোহরাওয়ার্দী-শরৎ বসু প্রস্তাবের সঙ্গে মুসলিম লীগের কোন সম্পর্ক নেই। তারা প্রকাশ্যে মন্তব্য করেন, সোহরাওয়ার্দী তথাকথিত উদার হিন্দুদের সাথে মিলে বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পাকিস্তানের পরিবর্তে অখন্ড সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন। মুসলিম লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে আকরাম খাঁ ও নাজিমুদ্দিন তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণেই সে সময় সোহরাওয়ার্দীর বিরোধিতা করে অখন্ড বাংলা পরিকল্পনা থেকে সরে গেছেন।

তবে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ভূমিকা ততো স্পষ্ট নয়। কারণ তার অনুগত হাসান ইস্পাহানি বলেছেন, সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর সমর্থন পান নি। জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দীকে অখন্ড বাংলা পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। কারণ তা হলে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হোসেন ইমাম বলেন, গান্ধী ও কংগ্রেসের সম্মতি পেলে জিন্নাহ এ ব্যাপারে মত দেবেন বলে সোহরাওয়ার্দীকে বলেছিলেন। বঙ্গীয় লীগ নেতা মাওলানা রাগীব আহসান বলেন যে, জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন দিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন, " জিন্নাহর মত নিয়ে আমি এ পদক্ষেপ নিয়েছি।" বসু-সোহরাওয়ার্দী ফর্মুলার ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোন বিবৃতি না দিলেও জিন্নাহ সম্ভবত তাঁদের যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি পছন্দ করতেন না। কারণ এটি ছিল মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বের পরিপন্থী। অনেকে মনে করেন সোহরাওয়ার্দী-জিন্নাহ সম্পর্ক তেমন মধুর ছিল না। তাঁরা পরস্পরকে তেমন বিশ্বাস করতেন না। অবাঙালি পরিষদ সদস্যরাও বাঙালি সদস্যদের ব্যাপারে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। যার জন্যে সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা, আবুল হাশিমের মত নেতাও তাদের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্য হননি। স্বাভাবিকভাবে বসু-সোহরাওয়ার্দী ফর্মুলার মত একটি বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনাকে তারা নিরুৎসাহিত করেছেন।

কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াঃ অখন্ড স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তির প্রতি কংগ্রেস হাই কমান্ডের বিশেষ করে নেহেরু ও সরদার প্যাটেলের প্রতিক্রিয়া আদৌ ইতিবাচক ছিল না। অখন্ড স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনাকে একটি ফাঁদ হিসেবে আখ্যায়িত করে প্যাটেল কয়েকজন হিন্দু ও কংগ্রেস নেতাকে এ ফাঁদে পা না দেয়ার জন্য সতর্ক করে দেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "বাংলার অমুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে বাংলাকে অবশ্যই বিভক্ত করতে হবে।" কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সংখ্যা অনুপাতে এই আশংকা ছিল অমূলক। মূলত কংগ্রেস হাই কমান্ড বাংলা বিভক্তির প্রশ্নে অটল ছিলেন এবং তারা ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হোক তা চাননি।

স্পষ্টত, কংগ্রেসের হাই কমান্ডের কাছে আশু বিবেচ্য বিষয় ছিল সম্পদ সমৃদ্ধ পশ্চিম বাংলা, বিশেষ করে কলকাতা শহর। তা ছাড়া পেট্রোল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ আসামও তাদের বিবেচনায় ছিল। তাছাড়া আসাম ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এর সঙ্গে রেলপথে মূল ভূখন্ডে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা থাকত না। আসলে কংগ্রেস হাই কমান্ডের বিশ্বাস ছিল বাংলার বিভক্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে না, কেননা অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক যে কোন দিক বিবেচনায় এককভাবে পূর্ববাংলার টিকে থাকার সম্ভাবনা ছিল না।

তবে ১৯৪৭ সালের ২৭ মে এক সংবাদ প্রতিনিধির কাছে নেহেরু এ অভিমত ব্যক্ত করেন, "ইউনিয়নের (অর্থাৎ হিন্দুস্তান) অভ্যন্তরে বাংলা অবস্থিত থাকার একমাত্র এ শর্তে আমরা বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সম্মত হয়েছি।" মূলত নেহেরুর এই মনোভাবের পর অখন্ড স্বাধীন বাংলা নিয়ে যে নাটক, তার যবনিকাপাত ঘটে। প্রসঙ্গত, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের একটি অংশ এ প্রস্তাবকে 'প্রাদেশিকতা' বলে বিরোধিতা করেছিল।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতিক্রিয়াঃ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু সহ কয়েকজন নেতা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যুক্ত বাংলা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি তখন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি সুকৌশলে এ বিষয়টি এড়িয়ে যান। গান্ধীর কাছ থেকে কোন সহযোগিতা না পেয়ে সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু নিজেরা পরিকল্পনাটির পক্ষে জনমত গড়ার চেষ্টা করেন।

ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়াঃ ধারণা করা স্বাভাবিক যে, অখন্ড স্বাধীন বাংলা গঠনের ব্যাপারে ব্রিটিশ গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুকূল ছিল না বলে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হয়। কিন্তু চিত্রটি প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বাংলার গভর্নর এফ. বারোজ অখন্ড স্বাধীন বাংলার দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করলেও ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন এ

ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। যেহেতু তাকে বিষয়টি 'সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ' থেকে বিচার করতে হয় বলে প্রথমদিকে একে তার কাছে বাঞ্চনীয় মনে হয়নি। তবে বারোজের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে মাউন্টব্যাটেন বাংলাকে অবিভক্ত রেখে স্বাধীনতা প্রদানে সম্মত হন বটে, তবে তা কোন অবস্থাতেই তার সর্বভারতীয় অবস্থানকে ক্ষুন্ন করে নয়। অন্যদিকে ভারত সচিব লিস্টওয়েলও বাংলাকে অবিভক্ত অবস্থায় স্বাধীনতা লাভের সুযোগ দানের পক্ষপাতি ছিলেন। ভারত বিভাগের প্রস্তাব নিয়ে লন্ডন গমন করার পূর্বে মাউন্টব্যাটেন চান নি যে সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব পরিত্যাগ করেন। তিনি চূড়ান্ত পরিকল্পনা নিয়ে ৩১ মে ফিরে আসেন। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের বিরোধিতার ফলে স্বাধীন বাংলা সম্পর্কে সকল আশা দূরীভূত হয়। সুতরাং কংগ্রেসের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি গ্রহণ না করার ফলে মাউন্টব্যাটেনও এ পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হবে না ভেবে পরিত্যাগ করেন।

অন্যান্য দল ও সম্প্রদায়ের ভূমিকা: স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার ব্যাপারে ফজলুল হক সক্রিয় ভুমিকা পালন করেননি। তিনি বরং লাহোর প্রস্তাব অনুসারে বাংলা-আসাম নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সমর্থক ছিলেন। বাংলার তফসিলী সম্প্রদায় যুক্ত বাংলাকে সমর্থন করে। এ সম্প্রদায়ের নেতা কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বলেন, "বাংলার হিন্দু তফসিলী সম্প্রদায় বাংলা ভাগ চায় না।" তিনি দাবি করেন বাংলার ৬৮% হিন্দুই তফসিলী। তফসিলী জাতি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কামিনী প্রসন্ন মজুমদারও অবিভক্ত বাংলা সমর্থন করেন। বাংলার প্রাদেশিক যাদব সম্প্রদায়ের নেতা মাখন লাল যাদব, উপেন্দ্র ঘোষ যাদব প্রমুখ বিবৃতিতে বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধিতা করেন। যদিও হিন্দু মহাসভার প্রধান ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এর বিরোধিতা করেন।

যুক্ত বাংলা প্রস্তাবের ব্যর্থতার কারণ

সাংগঠনিক কারণ: প্রস্তাবের সংগঠকগণ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গকে একই সমান্তরালে এনে প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করাতে না পারায় স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

প্রশাসনিক কারণ: ১৯৩৭-১৯৪৭ এ এক দশক যাবত বাংলার প্রশাসনে মুসলমানদের প্রতিপত্তি ছিল বলে কংগ্রেস ও হিন্দু সম্প্রদায় প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনের সুযোগ না পেয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে এক ধরনের সম্পৃক্তহীনতা জন্ম নেয়। ফলে হিন্দু ও মুসলামানদের মধ্যকার ঐক্যের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। একই সময়ের মধ্যে বাংলার চিফ মিনিস্টার ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্দেশে বহুবার প্রয়াস চালান। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হাই কমান্ডের বিরোধিতার কারণে সে উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

জনসংখ্যার বিভাজন: জনসংখ্যার বিভাজন স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিম বাংলায় হিন্দু ও পূর্ববাংলায় মুসলিম জনবসতি বেশি থাকায় হিন্দুদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি হয়। পশ্চিম বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গের ফলে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ কলকাতা ও খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ এলাকা তাদের দখলে থাকবে। তারা বুঝেছিল যে, এর ফলে মুসলমানদের সঙ্গে ভাগাভাগি না করে তারা নিজেরা একক শাসন ক্ষমতা লাভ করবে।এটি তাদের বাংলা বিভক্তির আন্দোলনকে জোরদার করে।

প্রাধান্যের কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা: ১৯৩৭-১৯৪৭ সালে মন্ত্রিসভায় মুসলিম প্রাধান্যের কারণে কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ প্রশাসন থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বন্ধন শিথিল হয়ে

পড়ে। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট তারিখে সংঘটিত ভয়াবহ 'কলকাতা দাঙ্গা' এবং এর অব্যবহিত পরে নোয়াখালীর দাঙ্গার পর বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় শংকিত হয়ে পড়ে এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাট ফাটল ধরে। তাছাড়া এই সুযোগে হিন্দু মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর সুযোগ লাভ করে বিভিন্ন গুজব ছড়ায়।

বিলম্বিত প্রয়াস: যুক্ত বাংলা প্রয়াসের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল বিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করা। বাংলার গভর্নর বারোজ সহ অখন্ড স্বাধীন বাংলা উদ্যোগের প্রবক্তারা সে কথা বহুবার উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অনেকের মতে প্রস্ড়াবটি কমপক্ষে আরো এক বছর পূর্বে উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা খুব বিলম্বে এসেছে। ফলে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে দেশ বিভাগের পরিকল্পনা থাকলেও ১৯৪৭ সালের ২ জুনের মধ্যে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন এ ব্যাপারে (অখন্ড বাংলা) সোহরাওয়ার্দীকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সম্মতি সংগ্রহ করতে বলেন। সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনা প্রকাশ করেন ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল। বিলম্বে পরিকল্পনাটি প্রকাশ করায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেনি। ফলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ডোমিনিয়ন মর্যাদায় বাংলার তৃতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও সর্বভারতীয় স্বার্থে সেই পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়েছে। যুক্ত বাংলার উদ্যোগটি যখন নেয়া হয় তখন রাজনৈতিক বিভেদ, সন্দেহ চরম আকার ধারণ করেছিল, জনগণও ছিল সাম্প্রদায়িক আবেগে বিভক্ত। ফলে অখন্ড স্বাধীন বাংলার মহৎ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

কংগ্রেসের অসহযোগিতা: সোহরাওয়ার্দীর বিপক্ষে বাংলার হিন্দুদের বড় একটা অংশকে সংগঠিত করলেও অখন্ড বাংলা আন্দোলনের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সেটা খুব বড় কারণ ছিল না। আন্দোলনের ভাগ্য মুখ্যত কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নির্ধারিত হয় এবং এ প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার মূলে ছিল কংগ্রেস হাইকমান্ডের ভেটো প্রদান। যেখানে একটা পর্যায় পর্যন্ত যুক্ত বাংলার ক্ষেত্রে মুসলিমলীগের মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সম্মতি ছিল, সেখানে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় অংশ বিশেষ করে জওহরলাল নেহেরু ও সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল আগাগোড়া এর ঘোর বিরোধিতা করতে থাকেন। তাঁদের মত পরিবর্তন করাতে কিরণ শংকর রায় এমনকি মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সমর্থ ছিলেন না। ফলে কংগ্রেসের অনড় অবস্থান ভারত বিভাগ ত্বরান্বিত করে এবং অখন্ড বাংলা গঠনের স্বপ্ন ব্যর্থ করে দেয়।

বঙ্গীয় লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে অনৈক্য: প্রাদেশিক বঙ্গীয় মুসলীম লীগ ও বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির অনৈক্য অখন্ড বাংলা গড়ার অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা বিভাগের ক্ষেত্রে সিলেটের মত রেফারেন্ডাম দেয়া হয়নি। বাংলা বিভক্তির ওপর গণভোট আয়োজন করার হলে আন্দোলন সফল হতো। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে তা হয়ে ওঠে নি। কেউ কেউ বলেন, বাংলা বিভক্তি রদ করা জন্য সোহরওয়ার্দী অখন্ড বাংলা আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঠিক নয়। তিনি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বাধীন অখন্ড বাংলা দাবি করেন।

যুক্ত বাংলা বা বৃহত্তর বাংলা আন্দোলনে বঙ্গীয় লীগের রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ, পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলা এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া ছিল সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ ও খাজা গ্রুপ। খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ ও মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ অবিভক্ত বাংলা, পূর্ণিয়া ও আসাম নিয়ে অবিভক্ত/বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় নাজিমুদ্দিন গ্রুপের জয় হয়। এই পরাজয় শুধু সোহরাওয়ার্দী গ্রুপেরই নয়, গোটা বঙ্গীয় মুসলীম লীগের পরাজয়। এর ফলে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা মুসলিম লীগে বিভক্ত হয়, পূর্ববাংলা মুসলিম লীগের ভেতর অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি

হয়। এর মধ্যেও সোহরাওয়ার্দী ও খাজা উপদল ছিল। প্রথমোক্তটি হতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সৃষ্টি হয়।

দূরদর্শিতার অভাব: বসু-সোহরাওয়ার্দীর দূরদর্শিতা, দৃঢ় মনোবল ও উদার মনোভাবের অভাব বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ। বাঙালি শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবল থাকায় অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ এই সুযোগটাই গ্রহণ করেছে।

কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা: স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি এমন ভূমিকা রেখেছিল, যা হিন্দু মহাসভার বিরোধিতার চেয়ে কম ভূমিকা পালন করে নি। পার্টির পত্রিকা 'স্বাধীনতা'য় ভালো করে জেনে শুনেই তারা ছেপেছিল যে ভারত ভাগ হলেও বাংলা ভাগ হবে না; বাংলা একটি পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হবে। কিন্তু 'স্বাধীনতা' এক সংখ্যায় ছেপেছিল যে, বাংলা হবে 'বৃহৎ বাংলা' যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হবেন। স্বাভাবিকভাবেই এরপর মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিল। তারা শরৎ বসু বা আবুল হাশিম কারো ওপরই আস্থা রাখতে পারলো না। ফলে বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যাহত হলো।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে ঐ বছরের প্রথম দিক থেকেই বাংলার দু'অংশ পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলাকে অখন্ড ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যোগ নেন। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও শীর্ষস্থানীয় অবাঙালি নেতৃবৃন্দের বিরোধিতার কারণে তা ব্যর্থ হয়। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ব্রিটিশ সরকার ভারত বিভাগের সঙ্গে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের পরিকল্পনা করে। কংগ্রেস ও পরে মুসলিম লীগ তা মেনে নিলে বাংলা বিভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। অবশ্য এরপরও সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলার ব্যাপারে এ উদ্যোগ অব্যাহত রাখেন। ৩০ জুন মাউন্টব্যাটেন কলকাতা এলে তিনি তাঁকে রাজি করানোর চেষ্টা করেন। যদিও ভাইসরয় এ পকিল্পনাকে নাকচ করে দেন। ১৯৪৭ সালের ১৩ আগস্ট পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার চিফ মিনিস্টার হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও পরের দিনই অর্থাৎ ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অংশে এবং পশ্চিমবাংলা ভারতের অংশে যায়। যুক্ত বাংলা গঠনের সকল উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার এখানেই যবনিকাপাত ঘটে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। এম.এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০২।
২। সিরাজউদ্দিন আহমদ, *হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*, ঢাকা, ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৬।
৩। আবু আল সাঈদ, *সাতচলি-শের অখন্ড বাংলা আন্দোলন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।
৪। ড. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা, সময় প্রকাশনী, ১৯৯৯।
৫। হারুন-অর-রশীদ, "অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ১ম খন্ড, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। যুক্ত বাংলার কথা সোহরাওয়ার্দী কোথায় প্রথম ঘোষণা করেন-

(ক) লাহোর (খ) কলকাতা

(গ) দিল্লি (ঘ) ঢাকা।

২। ১৯৪৭ সালে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন-

(ক) জওহর লাল নেহেরু (খ) কিরণ শংকর রায়

(গ) শরৎ বসু (ঘ) শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।

৩। বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তিতে সংবিধান পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত ছিল-

(ক) ২০ (খ) ২৫

(গ) ৩০ (ঘ) ৪০।

৪। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের প্রাক্কালে বাংলার গভর্নর ছিলেন-

(ক) মাউন্টব্যাটেন (খ) লিস্টওয়েল

(গ) লর্ড কার্জন (ঘ) এফ. বারোজ।

৫। ১৯৪৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার ছিলেন-

(ক) ফজলুল হক (খ) নুরুল আমীন

(গ) খাজা নাজিমুদ্দিন (ঘ) আকরাম খাঁ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। সংক্ষেপে ১৯৪৭ সালের বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তির বর্ণনা দিন।

২। বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তি সম্পর্কে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ১৯৪৭ সালে যুক্তবাংলা প্রস্তাবের কারণ বর্ণনা করুন। বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তি ব্যাখ্যা করুন।

২। বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ও ব্যর্থতার কারণ আলোচনা করুন।

পাঠ-৭

বাংলার বিভক্তি (১৯৪৭)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *বাংলা বিভক্তির পটভূমি জানতে পারবেন;*
- *১৯৪৭ সালে বাংলার নতুন সীমানা বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *সীমানা নির্ধারণের ফলাফল আলোচনা করতে পারবেন।*

ঐতিহাসিক এম. এ. রহিম "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, "এটি বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, হিন্দু নেতাগণ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বঙ্গভঙ্গ রদ করেছিলেন তারাই আবার ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ বিভাগের দাবি করেছিলেন। আবার যে মুসলমান নেতারা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার খুশি হয়েছিলেন তারা ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন।" প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক সমঝোতার অভাব, ব্রিটিশ সরকারের আন্তরিকতার অভাব সর্বোপরি তৎকালীন ভারতবর্ষের দু'টি প্রধান দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতার কারণে অবশেষে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির সাথে সাথে বাংলাও বিভক্ত হয়। এভাবে ১৯০৫ সালে বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করা হয়, অন্যদিকে ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগ ও বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিদের বিভক্ত করে।

ক. বাংলার বিভক্তির পটভূমি

১. ব্রিটিশ সরকারের আগ্রহ: বাংলা একটি সমৃদ্ধশালী প্রদেশ ছিল। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর কলকাতার রাজধানী স্থাপনের ফলে এর গুরুত্ব ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গ সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের সময় কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর হলেও বাংলার কেন্দ্র হিসেবে কলকাতা সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে বহাল থাকে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলের লক্ষবস্তু ছিল পশ্চিমবঙ্গকে নিজ নিজ প্রভাব বলয়ে রাখা। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম লীগ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির প্রস্তাব দিলে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান দাবির ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করলে এই দাবি প্রতিরোধের জন্য কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব দেন। মুসলিম লীগ তখন ভারত বিভাগের পক্ষে থাকলেও বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তির পক্ষে ছিল না। অবশ্য ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভ ও ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের জয়লাভ ভারতের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। শ্রমিকদল ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারে বিশ্বাসী হলেও ভারত বিভাগের বদলে অখন্ডতা বজায়

রাখার পক্ষপাতী ছিল। তবে নতুন প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পক্ষে এ নির্বাচন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস সেই মুহূর্তে পাকিস্তানের বিপক্ষে ছিল। অন্যদিকে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির যৌক্তিকতা এ নির্বাচনের রায়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

২. ১৯৪৬ সালের নির্বাচন: ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ ১২২টি আসনের মধ্যে ১১৭টি লাভ করেন। অন্যান্য প্রদেশগুলোতেও মুসলিম লীগ জয়ী হয়। প্রাাদেশিক আইন পরিষদের মোট ৫০৭টি সদস্য আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ৪৭২টি আসন পায়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলিম লীগ মুসলমানদের সবগুলো আসনেই জয়ী হয়।

৩. মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার সুপারিশ বাস্তবায়ন: নতুন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে 'মন্ত্রী মিশন' নামে একটি প্রতিনিধি দলকে ভারতে পাঠায়। ১৬ এপ্রিল জিন্নার সাথে মন্ত্রী মিশনের বৈঠকে পাকিস্তান দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দিল্লিতে এই বৈঠকে লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখিত 'রাজ্যসমূহের' বদলে 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। মন্ত্রী মিশন কংগ্রেস ও লীগের সাথে বৈঠকের পর মে মাসে তাদের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। যদিও এতে ভারত বিভক্তির কথা পরিষ্কার বলা হয়নি। তবে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। মুসলিম লীগ মিশনের গ্রুপিং ব্যবস্থার মধ্যে তাদের পাকিস্তান পরিকল্পনার দাবির স্বীকৃতি ও কংগ্রেস এককেন্দ্রিক সরকার গঠনের মধ্যে ভারতের অখন্ডতার স্বপ্ন দেখেন। মন্ত্রী মিশন কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্তে মুসলিম লীগ রাজি হলেও কংগ্রেস রাজি হয়নি। নিয়মানুযায়ী মুসলিম লীগকে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেয়ার কথা থাকলেও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতমূলক নীতির কারণে তা সম্ভব হয় নি। জুন মাসে নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। মুসলিম লীগ এর বিরোধিতা করে।

৪. মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা: ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে এ সম্মেলনে মুসলিম লীগ পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। এর ফলে রাজনৈতিক অবস্থা জটিল হয়ে পড়ে। ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগ দেশব্যাপী 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করলে পরিস্থিতি সাম্প্রদায়িক সংঘাতের দিকে যায়। কলকাতায় শুরু হয় দাঙ্গা। যদিও এক-চতুর্থাংশ মুসলিম অধ্যুষিত কলকাতার মুসলমানরাই বেশি ক্ষতির শিকার হয়। দাঙ্গা ক্রমান্বয়ে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীসহ অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতা দাঙ্গার জন্য কংগ্রেস সোহরাওয়ার্দীকে দায়ী করে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেও অনাস্থা প্রস্তাব ভোটে বাতিল হয়। অন্যদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ভারতে সাম্প্রদায়িক সংকট কেন্দ্রিক আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়।

৫. ভারত ও বাংলা বিভাগে কংগ্রেসের অতি উৎসাহী মনোভাব: এ পরিস্থিতিতে নেহেরু ও প্যাটেল ভারত বিভাগের ব্যাপারে তাদের ইতিবাচক মনোভাব দেখাতে থাকেন। ভি. পি. মেনন বলেন, ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে অথবা পরের বছর জানুয়ারি মাসেই তিনি এ দুই নেতাকে ভারত বিভক্তিতে রাজি করান। এসময় সর্বপ্রথম ভারত বিভাগের সাথে কংগ্রেস বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবিও উত্থাপন করে। ইয়ান স্টিফেনস এ সম্পর্কে বলেন, ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এরকম দাবি করা হতে থাকে যে, যদি প্রকৃতই উপমহাদেশ বিভক্ত করা হয়, তাহলে তাদের প্রদেশও বিভাগ করতে হবে। কারণ উভয়

প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুবই সামান্য এবং বিরাট সংখ্যক অমুসলমান অধিবাসীদের স্থায়ীভাবে পাকিস্তানে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ বছর মার্চ মাসে পাঞ্জাবের শিখরাও একই দাবি জানালে কংগ্রেসের অধিবেশনে পাঞ্জাবকে দু'ভাগ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর সাথে যুক্ত হতে থাকে বাংলা বিভক্তিও। ৪ মার্চ প্যাটেল ঘোষণা করেন, যদি মুসলিম লীগ ভারত বিভাগের দাবি ত্যাগ না করে তবে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের দাবি করা হবে। এই বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয় যে, কংগ্রেসের বাংলা বিভক্তির হুমকি ছিল প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লীগকে পাকিস্তান প্রস্তাব থেকে দূরে সরিয়ে আনা। তবে কংগ্রেসের এই মনোভাব থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, কংগ্রেস ভারত বিভাগের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি এ সময় ১৯৪৮ জুন মাসে ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। এ উদ্দেশে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে নতুন ও শেষ বড়লাট নিযুক্ত করা হয়। দীর্ঘ আলোচনার জন্য কংগ্রেস ও লীগের প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারত বিভক্তি দাবিতে রাজি হন। যদিও কংগ্রেস নতুন একটি দাবি উত্থাপন করে, তা হলো বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তিকরণ। জিন্নাহ, সোহরাওয়ার্দী সহ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এর বিপক্ষে ছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেন হিন্দু মহাসভা। এভাবে বর্ণ হিন্দুদের নেতৃত্বে বাংলা বিভাগ আন্দোলন ক্রমে শক্তিশালী হতে থাকে।

৬. মাউন্টব্যাটনের কংগ্রেসের প্রতি পক্ষাবলম্বী মনোভাব: মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ থেকে তাঁর কাজ শুরু করেন। অচল প্রায় কেন্দ্রীয় শাসন, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, আইন-শৃংখলার চরম অবনতি- এমনি পরিস্থিতিতে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেন। প্রথম থেকেই তিনি কংগ্রেসের পক্ষাবলম্বন করেন। লিউনার্ড মাসলির মন্তব্য থেকে এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাসলির ভাষ্য মতে, মাউন্টব্যাটেন প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনায় বলেন, মুসলিম লীগের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে চেষ্টা করে ভারতের ঐক্য ও অখন্ডতা অপেক্ষা মুসলমানদের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ছেড়ে দেয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। নেহেরু ও প্যাটেল মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তবে পাকিস্তানের দাবি দুর্বল করার জন্য পাঞ্জাব ও বাংলার অমুসলমান অধ্যুষিত এলাকা পৃথক করার দাবি অব্যাহত রাখেন। জিন্নাহ কংগ্রেসের এ দাবিকে 'চক্রান্ত' বলে অভিহিত করেন। বরং তিনি সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে লোক বিনিময়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহকে অখন্ড ভারত এবং খন্ডিত বাংলা ও পাঞ্জাব- এ দু'টির মধ্যে একটি পছন্দ করতে বলেন। তিনি এও বলেন যদি জিন্নাহ পাকিস্তান দাবি আকড়ে ধরে থাকেন তবে এই প্রদেশদ্বয় ভাগ করা হবে। এ পর্যায়ে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন তাঁকে হয় অখন্ড ভারত এবং অখন্ড পাঞ্জাব ও বাংলা অথবা খন্ডিত পাঞ্জাব ও বাংলা গ্রহণ করতে হবে। জিন্নাহ এ সময় তাই দ্বিতীয় সমাধান বিবেচনা করতে থাকেন।

৭. বাংলা বিভাগের পক্ষে কলকাতার জনমত গঠন: মাউন্টব্যাটেনের একপেশে ও কংগ্রেস ঘেষা নীতির কারণে এ সময় পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের বড় অংশ বঙ্গ বিভাগের পক্ষে অবস্থান নেয়। ১৯৪৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে কংগ্রেস ও মহাসভার নেতৃবৃন্দ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে এই ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দেয়। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলা হতে আলাদা হয়ে পৃথক প্রদেশের প্রস্তাব করেন। পূর্ববাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এটা মেনে নিতে রাজি হননি। আনন্দবাজার ও হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা বাংলা বিভাগের পক্ষে ছিল। এপ্রিলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকেও বাংলা বিভাগ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৮. অখন্ড বাংলা আন্দোলনের ব্যর্থতা: তবে বাংলা বিভাগের বিপক্ষে ছিল মুসলিম লীগ ও শরৎ বসুর নেতৃত্বে কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য। মূলত মার্চ-এপ্রিলে যুক্ত বাংলার পক্ষে আন্দোলন গড়ে ওঠে।

সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের এ আন্দোলনে প্রথমে কেন্দ্রীয় লীগও সমর্থন দেয়। সোহরাওয়ার্দী এপ্রিলে দিল্লিতে এক বক্তৃতায় স্বাধীন অখন্ড বাংলার প্রস্তাব দেন যা শরৎ বসু সমর্থন করেন। তাঁরা উভয়ে এ লক্ষে ২০ মে বৈঠক শেষে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যা সোহরাওয়ার্দী-বসু চুক্তি নামে পরিচিত। কিন্তু কংগ্রেস এ পরিকল্পনা ও চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। কেন্দ্রীয় লীগের অধিকাংশ সদস্য এর বিরোধিতা করে। এমনকি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি আকরাম খাঁ এ প্রস্তাব সমর্থন করেননি। বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় লীগ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে এ ব্যাপারটি বেশি দূর অগ্রসর হয়নি।

৯. বাংলা বিভাগ চূড়ান্তকরণ এবং মুসলিম লীগের সম্মতি প্রদান: ১৯৪৭ সালের জুন মাসে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার আওতায় বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ব্যবস্থা করে। কংগ্রেস তাৎক্ষণিক এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। জুন মাসে মুসলিম লীগের সভায় জিন্নাহ তাঁর জীবদ্দশায় পাকিস্তান দেখার ইচ্ছে পোষণ করে কাউন্সিলারদের প্রতি ব্রিটিশ প্রস্তাব সমর্থনের আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, আমাদের ব্রিটিশ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে (পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগসহ) মেনে নিতে হবে অথবা সম্পূর্ণ নাকচ করতে হবে। পরিষদের ৪৫০ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। এমনকি সোহরাওয়ার্দী নিজে প্রস্তাবের পক্ষে রায় দেন। এরপর যুক্ত বাংলার পক্ষে সকল উদ্যোগ শেষ হয়।

মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনানুযায়ী বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের সদস্যরা ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পৃথক পৃথক বৈঠকের পর বাংলা ভাগ চূড়ান্ত হয়। পরের মাসের ১ তারিখে ব্রিটিশ সরকার ভারত বিভাগের চূড়ান্ত আইন জারি করে। এভাবে বাংলা বিভক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৮ জুলাই ভারত স্বাধীনতা আইনে বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করে পশ্চিমবাংলাকে ভারতের এবং পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের অংশ বলে ঘোষণা করে।

খ. ১৯৪৭ সালে বাংলার সীমানা নির্ধারণ

জুন মাসে বাংলার সীমানা নির্ধারণের জন্য কমিশন গঠিত হয়। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার পর কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ বাংলার সীমানা ঘোষণা করেন। এ ঘোষণায় কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। নদীয়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ (৬১% মুসলমান) জেলা হওয়া সত্ত্বেও এর দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা পশ্চিমবাংলাকে দেয়া হয়। সম্পূর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলা (৫৬.৬% মুসলমান) পশ্চিমবাংলায় যায়। মালদহ (৫৭% মুসলমান) জেলার নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, নাচোল, গোমস্তাপুর এবং ভোলাহাট এই পাঁচটি থানা পূর্ববাংলায় দেয়া হয়। যশোর জেলার বনগাঁও (৫৩% মুসলমান) ও নৌহাটা পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হয়। খুলনা (৪৯.৩৬% মুসলমান) পূর্ববাংলাকে দেয়া হয়। মুসলমান অধ্যুষিত মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি এলাকা ভারতকে প্রদানের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ববাংলাকে দেয়া হয়। সিলেট জেলার বড় অংশ রেফারেন্ডামের মাধ্যমে পূর্ববাংলা পায়। বাংলার সীমানা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবগঠিত পূর্ববাংলা অবিভক্ত বাংলার মোট ৬৩.৮% এলাকা এবং জনসংখ্যার ৬৪.৮৬% লাভ করে।

গ. ফলাফল

বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমান নেতাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তাঁরা বাংলা অখন্ডতা বজায় রাখতে চেয়েছেন। যদিও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে জিন্নাহর আগ্রহে শেষপর্যন্ত

বাঙালি নেতারা বাংলা বিভাগে রাজি হন। সোহরাওয়ার্দী তাঁর অখন্ড বাংলা প্রস্তাব থেকেও সরে আসতে বাধ্য হন। তবে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লীগ নেতারা পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি বা বাংলা বিভাগ চেয়েছিল সে আশা পূর্ণ হয়নি। ভারত বিভাগে মাউন্টব্যাটন যেমন কংগ্রেসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন, তেমনি বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্তের পর গঠিত সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান র‍্যাডক্লিফ কংগ্রেসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন। ইতোমধ্যে ২২ জুলাই কমিশনের এক সভায় লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উত্থাপিত একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নেন যাতে বলা হয় তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে এবং কোনো সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। কমিশনের সদস্যদের কোন ক্ষমতাই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইচ্ছে মতো সীমানা নির্ধারণ করায় বাংলা বিভাগ বহু সমস্যার সৃষ্টি করে। অনেক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিন্দু প্রধান ভারতের অধীনে যায়। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া জেলায় মুসলমানরা ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে আনন্দ উৎসব করে। অথচ পরেরদিন তারা জানতে পারে তারা ভারতের অধীনে গিয়েছে। ড. মোঃ মাহবুবর রহমান যথার্থই বলেছেন, "সরেজমিনে তদন্ত না করে দিল্লির অফিসকক্ষে বসে মানচিত্রের ওপর সীমানা চিহ্নিত করায় সীমানা কোনো ক্ষেত্রে একটি গ্রামকে দ্বিখন্ডিত করে। কোথাও তা বাড়ির আঙিনার মাঝখান দিয়ে যায়। কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় কারো ঘরের দরজা পড়েছে পাকিস্তানে আর জানালা পড়েছে ভারতে।" যদিও এই অসম সীমানা সাময়িক ক্ষোভের সৃষ্টি করে। অবশ্য দেশত্যাগ, সম্পদ বন্টন ইত্যাদি স্বার্থের আবর্তে তা চাপা পড়ে যায়। বাংলার মানুষ নতুন করে জীবন শুরু করে। কিন্তু পূর্ববাংলা আবারো পাকিস্তানি শোষণের শিকার হয়, আবারো পরাধীন হয়। একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ পরাধীনতার অবসান ঘটায় বাঙালি জাতি।

সারসংক্ষেপ

মূলত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতার কারণে ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্তি হয়। দুই বঙ্গের বাঙালি নেতৃবৃন্দের যুক্ত বাংলা গঠনের উদ্যোগ এতে ব্যর্থ হয়। পশ্চিমবঙ্গসহ বেশ কিছু এলাকা ভারতের অধীনে যাওয়ায় সম্পদশালী এলাকা যেমন দিল্লির শোষণের শিকার হয়, তেমনি পূর্ববাংলা পাকিস্তানি শোষণের শিকার হয়। পূর্ববাংলার জনগণ স্বাধীনতার মাধ্যমে বাংলা বিভাগ যে অযৌক্তিক ছিল তা প্রকাশ করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-৭১)*, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ১৯৯৯।

২। এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০২।

৩। আবু আল সাঈদ, *সাতচল্লিশের অখন্ড বাংলা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

৪। Joya Chatterji, *Bengal Devided*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শেষ বড়লাটের নাম-
(ক) এ্যাটলি (খ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন
(গ) লর্ড কার্জন (ঘ) র‍্যাডক্লিফ।

২। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে মুসলিম লীগের যে সভায় বাংলা বিভাগের পক্ষে ভোটাভুটি হয় তাতে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন ভোটের-
(ক) পক্ষে (খ) বিপক্ষে
(গ) মৌন (ঘ) অনুপস্থিত।

৩। ভারত শাসন আইন পাস হয় ১৯৪৭ সালের-
(ক) ১৪ আগস্ট (খ) ১৮ জুলাই
(গ) ১৫ আগস্ট (ঘ) ১০ আগস্ট।

৪। নব গঠিত বাংলার সীমানা চিহ্নিতকরণের পর পূর্ববাংলা লাভ করে অবিভক্ত বাংলার-
(ক) ৫৩.৮% এলাকা (খ) ৬৩.৮% এলাকা
(গ) ৬৩.১% এলাকা (ঘ) ৬৪.৮% এলাকা।

৫। বাংলার সীমানা চিহ্নিতকরণ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন-
(ক) লর্ড মাউন্টব্যাটেন (খ) এ্যাটলি
(গ) লর্ড কার্জন (ঘ) লর্ড র‍্যাডক্লিফ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। ১৯৪৭ সালের আগস্টের বাংলার নতুন সীমানার বর্ণনা দিন।

২। বাংলা বিভক্তির ফলাফল লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্তির পটভূমি আলোচনা করুন। বাংলা বিভক্তির ফলাফল বর্ণনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরমালাঃ

পাঠ-১ঃ ১. (খ); ২. (গ); ৩. (ঘ); ৪. (ক); ৫. (ঘ); ৬. (ক)।

পাঠ-২ঃ ১. (ঘ); ২. (গ); ৩. (ক); ৪. (খ); ৫. (গ); ৬. (খ)।

পাঠ-৩ঃ ১. (ঘ); ২. (খ); ৩. (খ); ৪. (খ); ৫. (গ); ৬. (খ); ৭. (গ)।

পাঠ-৪ঃ ১. (গ); ২. (ঘ); ৩. (গ); ৪. (গ); ৫. (ক); ৬. (ক); ৭. (খ); ৮. (গ)।

পাঠ-৫ঃ ১. (ক); ২. (গ); ৩. (ঘ); ৪. (ক) ৫. (গ)।

পাঠ-৬ঃ ১. (গ); ২. (গ); ৩. (গ); ৪. (ঘ); ৫. (খ)।

পাঠ-৭ঃ ১. (খ); ২. (ক); ৩. (খ); ৪. (খ); ৫. (ঘ)।